করুণা দেবীর আশ্রম

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

করুণা দেবীর আশ্রম

সূচী

করুণা দেবীর আশ্রম	...	...	১
ক্ষমতার জয়	...	...	১০
পাহাড়ের পথে	...	...	২৪
গোলাপ সিংহ	...	...	৩৬
স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল	...	...	৫৬
দীপ্তি	...	...	৭৪
বজ্র-ঝঙ্কার	...	...	৯০
শঠে শাঠ্যং	...	...	১০৪
কোন রোগ	...	...	১১৮
জামাইবাবু	...	...	১৩৮

করুণা দেবীর আশ্রম

পৃথিবীতে প্রচুর টাকা থাকে অনেকেরই, কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎ হৃদয় থাকে কদাচিৎ। বৃহত্তর আদর্শের অনুসরণে আত্মোৎসর্গ করিবার সাহস দেখিতে পাওয়া যায় আরও কদাচিৎ।

অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শিবলালবাবু এবং তাঁহার বিলাত ফেরৎ মোটা মাহিনাওলা পুত্র কাণপুর সহরের প্রতিপত্তিশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিবলালবাবুর পত্নী করুণাময়ী দেবী পাইয়াছেন বিপুল পৈত্রিক জমিদারী। বিশেষ ধনী পরিবার। রেডিও মোটরে, ইলেকট্রিক আলোয় আভিজাত্যের সবটুকু গৌরব ইঁহারা আবদ্ধ রাখিতেন না, দেশের ও দশের মঙ্গলে বেশ মোটা দান করিতেন, দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর দায়ে-ঘায়ে প্রচুর সাহায্য করিতেন।

ইঁহারা যখন সমাজত্যক্তা মেয়েদের আশ্রয় দিবার জন্য সহরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে অনাথা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং করুণা দেবী যখন নম্র দীনতায় পূজারিণীর নিষ্ঠা লইয়া সে আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন তখন সহরের অধিকাংশ লোকই বিস্ময়ে হতবাক হইল! যাঁহারা ইঁহাদের ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতেন তাঁহারা শ্রদ্ধাভরে এই পরিবারের মঙ্গল কামনা করিলেন। কেহই বিরুদ্ধ মন্তব্য করিলেন না, কোন প্রশ্নও নয়।

আশ্রমের কায অতি সুচারুভাবে চলিল। দেশ বিদেশের অনেক মেয়ে আসিয়া আশ্রমে স্থান পাইল। তাহারা সকলেই দৈবাৎ পদস্খলিতা, সকলেই পুনরায় সৎভাবে জীবন যাপনে ইচ্ছুক। ইহাদের কাহারও সঙ্গে ছোট ছোট শিশুও ছিল, তাহারাও সমাদরে আশ্রমে স্থান পাইল।

মেয়েরা উপবাস উপাসনায় চিত্ত শুদ্ধ করিয়া আশ্রমের প্রথানুযায়ী বিদ্যাশিক্ষা, শিল্পচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনায় নব জীবন গঠন করিতে লাগিল। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া পদস্খলিতা মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ চিত্তের নিষ্করুণ রূঢ়তা ক্রমে সহানুভূতি ও অনুকম্পায় পরিবর্ত্তিত হইল। উৎসাহী ধনী গৃহের গৃহিনীরা আসিয়া আশ্রমের সেবা ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে আসিয়া সেবায় যোগদান করিতে পারিলেন না তাঁহারা দূর হইতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ী দেবীর করুণায় আশ্রম সমাজে উঠিল, অর্থাৎ সমাজ ইহাকে সহিয়া লইল। আশ্রমের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নামকরণ হইল—**"করুণা দেবীর আশ্রম।"**

কয়েক বৎসর নির্ব্বিবাদে কাটিবার পর আশ্রমে বিপ্লব জাগিল যমুনাকে লইয়া।

চার বৎসর পূর্ব্বে সে যখন আশ্রমে আসে তখন সাত মাস গর্ভবতী সে। অচৈতন্য অবস্থায় তাহাকে যমুনা নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া কয়েকজন সদাশয় ভদ্রলোক উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে দেন। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে সুস্থ করিয়া আশ্রমে পাঠান।

নিজের বা আত্মীয় স্বজনের নাম ধাম সে কিছুই প্রকাশ করিবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অস্বাভাবিক অল্পভাষী ও অসাধারণ জেদী মেয়ে। কাহারও প্রশ্নের উত্তর দেয় না, শুধু কাঁদে। পদস্খলিতা নারীদের অনেকেই পূর্ব্ব জীবনের পরিচয় গোপন রাখিতে চায়, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত ঘরের দুর্ভাগিনীরা। লজ্জা, ঘৃণা, অনুতাপের পীড়নে পীড়িতা এই মেয়েটিকে করুণা দেবীর ইঙ্গিতে আর কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। যমুনা হইতে তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল—তাহার নাম রাখা হইল যমুনা।

যমুনার বয়স বছর পঁচিশ ত্রিশের বেশী নয়। মুখশ্রী চমৎকার, রং ধবধবে ফর্শা, দেহগঠন লম্বা চওড়া—সাধারণ ধনী-গৃহের ভোগ-বিলাসী অলস মেয়েদের মত। খানিকটা বোকামি, খানিকটা ভালমানুষী, খানিকটা একগুঁয়েমি মিশিয়া স্বভাবটি তৈরী। কিন্তু সরল মোটে নয়। সব বিষয়ে লুকোচুরি খেলিতে ভালবাসে। কোনও কথার স্পষ্ট উত্তর দেয় না। সর্ব্বদা যেন প্রচ্ছন্ন অভিমানে বিরক্তিগম্ভীর।

আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী করুণা দেবীর ধৈর্য্য অসীম, স্নেহপরায়ণতা অপরিসীম। আশ্রম তত্ত্বাবধায়িকা বিরজা দেবীকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "সর্ব্বদা কায দিয়ে ওকে অন্যমনস্ক রেখ। সদয় ব্যবহারে ওর স্বভাব সংশোধন কর।"

করুণা দেবীর স্বামী পুত্র ঘর সংসার আছে। সর্ব্বদা আশ্রমে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনি দুবেলা গাড়ী চড়িয়া আশ্রমে আসিতেন, ঘণ্টা খানেক সব দেখা শুনা করিয়া যাইতেন। বিরজা দেবী তাঁর দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী। নিষ্ঠাবতী, নিষ্কপট, ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু বিধবা সে। বুদ্ধিবৃত্তি চৌকশ, সর্ব্বদা অনলস। এই সব বাঁকাচোরা স্বভাবের মেয়েদের বিপথগামী মনকে সিধা পথে আনিবার জন্য তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত।

কায সোজা নয়। অতি-শ্রমের অত্যাচারে তিনিও সময় সময় বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি অসুস্থ হইয়াও পড়িতেন। সে সময় তাঁহার দুই সহকারিণী শ্যামা ও শান্তা আশ্রমের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিত। শ্যামা ও শান্তা আশ্রমের সবচেয়ে পুরাতন আশ্রিতা বিধবা।

যাই হোক, যমুনার দিকে সকলেই সদয় দৃষ্টি রাখিল। যথাসময়ে সে নির্ব্বিঘ্নে এক কন্যা প্রসব করিল।

মেয়েটি দিনে দিনে বড় হইয়া উঠিল। মেয়েটি খুব সুন্দরী, বেশ

হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু কেমন যেন হাবাগোবা গোছের, জড় মস্তিষ্ক। যথা সময়ের অনেক পরে সে কথা বলিতে শিখিল। যা শিখিল তাও অতি অল্প, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।

নিরপরাধ শিশু, ভগবানের জীব। আশ্রমের সকলেই তাকে স্নেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু মেয়েটার দিকে চাহিয়া যমুনার দৃষ্টি কেমন যেন হিংস্র, ভয়াবহ হইয়া উঠিত। সময় সময় মেয়েটার উপর সে অতি রূঢ় ব্যবহার করিত। তখন বিরজা দেবী মেয়েটাকে সরাইয়া অন্যের জিম্মায় রাখিতেন।

আশ্রমে জপতপ পূজা আরাধনার পর মেয়েদের জন্য নানা রকম বড়ি প্রস্তুত, পাঁপর প্রস্তুত, মুড়ি চিঁড়া ভাজা, আটা ময়দা প্রস্তুত করা হইতে লেখাপড়া শেখা, সৌখিন শিল্পকার্য্য করা পর্য্যন্ত নানাবিধ কার্য্য-বিভাগ ছিল। সব মেয়েই কোন না কোন বিভাগের কাযে মন বসাইয়াছিল। যে যে-বিষয়ে সুদক্ষ হইয়া উঠিত তাঁহাকে সেই বিভাগের কর্ত্রী করা হইত।

যমুনা কোন কাযে মন বসাইতে পারিল না। কিন্তু আলস্য চর্চ্চার সুযোগ আশ্রমে নাই। কাজেই রান্না ভাঁড়ারের কাযে বাধ্য হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হইত। ক্রমে সে রাঁধিতে শিখিল, তারপর আগ্রহের সহিত রাঁধিয়া বাড়িয়া নিঃশব্দে উৎসাহে সকলকে খাওয়াইতেও লাগিল। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া কাহারও সহিত কথা সে কহিত না।

করুণা দেবী ও বিরজা দেবী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলেন, মেয়েটার এবার আশ্রমে মন বসিয়াছে। কথা না বলুক, কাযের লোক। গতর খুব!

এমনিভাবে চার বছর কাটিল।

হঠাৎ আশ্রমের অদূরে গঙ্গার ধারে এক তেজঃপুঞ্জ-কান্তি দিব্য সুন্দর মূর্ত্তি জটাধারী সাধুর আসন পড়িল। সাধুর নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায়

পাণ্ডিত্য খ্যাতি শোনা গেল। সাধুর বয়স বোঝা শক্ত; প্রৌঢ় বলিতে বাধে, যুবা বলিতেও সন্দেহ হয়।

সহরের নিষ্কর্ম্মা কৌতূহলীর দল ভিড় করিয়া সাধুর চরণে ভাঙিয়া পড়িল।

একদিন সন্ধ্যার অবকাশে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া আশ্রমের মেয়েরাও সাধুকে প্রণাম করিতে গেল। যমুনাও তাহাদের সঙ্গে গেল।

সাধু সমাদরে তাহাদের বসাইয়া বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলেন। অনেক সদুপদেশ দিলেন।

যমুনা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাধুর দিকে চাহিয়া রহিল। সাধুও বার কয়েক চকিত কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন। তুচ্ছ ব্যাপার,বিরজা দেবী এসব গ্রাহ্য করিবার পাত্রী নহেন। মেয়েদের লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে যমুনা একা গঙ্গাস্নান করিতে গেল। অনেক বিলম্বে আশ্রমে ফিরিল। কৈফিয়ৎ দিল, কাল সাধুকে সে ঠিক চিনিতে পারে নাই, আজ গঙ্গার ঘাটে পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবার সে চিনিতে পারিয়াছে, সাধু তাহার দীক্ষাগুরু। সেইজন্য কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাই ফিরিতে তাহার একটু দেরী হইয়াছে।

মেয়েরা মুখ চাওয়াচায়ি করে। অভিজ্ঞ মনের কোণে সংশয়ের কালো ছায়া বিদ্যুৎবেগে লুকোচুরি খেলে।

বিরজা দেবী কঠোর স্বরে বলিলেন, "একা বাইরে যাওয়া আশ্রমের নিয়ম বিরুদ্ধ। আর যেও না। উনি তোমার গুরু? যেদিন প্রণাম করতে যাবে, শ্যামা কিম্বা শান্তার সঙ্গে যেও।"

কিন্তু বৃথা। তার নির্ব্বাক নিস্তব্ধ একগুঁয়ে প্রবৃত্তির মোড় ফিরানোর চেষ্টা নিরর্থক। সে লুকাইয়া লুকাইয়া একা সাধুর কাছে যাতায়াত

করিতে লাগিল। ধরা পড়িলে নীরবে তিরস্কার সহিত, ভাল মানুষের মত, বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত—যেন এসব তিরস্কারের অর্থ বোধগম্য করিবার শক্তি তাহার নাই!

বিরজা দেবী বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন—মেয়েটার মস্তিষ্ক বিকৃত।

করুণা দেবী সমস্ত শুনিয়া করুণাভরে বলিলেন, "গুরু দর্শনে যাওয়ায় বাধা দিও না।"

বিরজা বলিলেন, "যে মেয়ের বিচার বুদ্ধি জেগে আছে তাকে গুরু দর্শন কেন নরক দর্শনে পাঠাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি বিশ্বাস রাখি, সে সব মেয়ে নরকের আবিলতা রাশি দুহাতে তুলে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যের নিরিখে পরীক্ষা করেও পবিত্র থাকবে, আসক্তির পাঁকে নিজেকে ডুবুবে না। সে মেয়ে আছে আশ্রমের মধ্যে ওই শান্তা। শ্যামাকেও শ্রদ্ধা করি, ওর বুদ্ধি আছে, নিজেকে রক্ষা করতে জানে। একদা দৈবাৎ ওর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ছুটে এসে নিষ্কপট সরলতায় বল্লে, আমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন, কেঁদে মরে গেলেও বেরুতে দেবেন না। কিন্তু, এরা ত তা নয়! আমি ভয় করি ওই বিমলা যমুনার দলকে। ওরা ভিতর গোঁজা, মুখ বোজা বোকা-শয়তান। ওদের শিরায় শিরায় এখনও কলুষিত কামনার ঢেউ খেলছে!'

করুণা দেবী বলিলেন, "সে ত স্বাভাবিক বিরজা! স্বভাবের বিরুদ্ধে চেতন শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনা কি সোজা কথা? তাহলে এ আশ্রমের প্রয়োজন থাকত না। আমরা ওদের পবিত্র হবার জন্য সহায়তা কর্‌ব, দুর্ব্বলকে বল যোগাব, ওদের যথাসাধ্য মঙ্গল চেষ্টা কর্‌ব —এইটুকুই মাত্র আমাদের অধিকার। তারপর যে যার কর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌বেই। কিন্তু যমুনা—"

"অতি দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, আব্‌ছা। পূর্ব্ব সংস্কারের প্রেত ওর পিছু

পিছু ঘুরছে। আশ্রমের তন্ত্র মন্ত্রে তাকে পোষ মানাতে পারি, ভয় করি না, কিন্তু আত্ম সংশোধনে ওর দারুণ অবহেলা, লোভ রয়েছে এখনো প্রেতের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণে—ওকে ভয় করি সেইখানেই।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া করুণা দেবী দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "নিষিদ্ধ নয় জানি, কিন্তু নিন্দনীয়, তাই বল্‌তে সংস্কারে বাধে। কিন্তু আমার ছেলে বলে ঠিক—এ শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়েদের আবার বিবাহ দেওয়াই উচিত।"

একটু হাসিয়া বিরজা দেবী বলিলেন, "তাতে কোন শ্রেণীর মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সন্তান সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা? অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই আছে, এ ক্ষেত্রেও হয়ত দু দশটা থাকবে, কিন্তু অসংযত প্রবৃত্তির ক্রীতদাস যারা সে সব নরনারীর—"

"হাঁ হাঁ—নৈতিক চেতনা যাদের নিষ্ক্রিয়, সে সব নারীর আবার বিধবা বিবাহ কেন? কৌমার্য্য খণ্ডনও পাপ, অপরাধ। জানোয়ারের বাচ্চা জানোয়ারই হয়, হাজার চেষ্টা কর্‌লেও "মানুষ" তারা হয় না। জানবার উপায় নেই, নইলে জেনে নিতে ইচ্ছা হয় যমুনার মা বাপ কেমন লোক।"

বিরজা দেবী চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "তাঁরা হয়ত সৎ প্রকৃতিরই মানুষ, কিন্তু যমুনার জন্ম সময়ে যে তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল ছিল না তার প্রমাণ স্বয়ং এই যমুনা।"

"যাই হোক, ওর দিকে লক্ষ্য রেখ।"

কিন্তু লক্ষ্য রাখিয়াও তাল সামলাইতে পারা গেল না। যমুনা লুকাইয়া লুকাইয়া সাধুর কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একদিন আশ্রম হইতে যমুনার শিশু কন্যাটি অদৃশ্য হইল!

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িল। সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু যমুনা নির্ব্বিকার!

রাত্রে শিশু মায়ের কাছে ঘুমাইয়াছিল, সকালে উঠিয়া মা দেখে শিশু অদৃশ্য! বিচিত্র রহস্য!

সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিল, গঙ্গার তীর হইতে ঝুলি-ঝোলা সহ সাধুও অন্তর্হিত।

গুরুর এই আকস্মিক অন্তর্ধ্যান সংবাদেও যমুনা অবিচল, নির্ব্বাক! সহস্র প্রশ্নেও নিশ্চুপ! অদ্ভুত একজ্ঞায়িতা!

শেষে সংক্ষেপে বলিল, "তিনিই মেয়েকে নিয়ে গেছেন।"

করুণা দেবী আসিলেন। নিভৃতে যমুনাকে ডাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "যমুনা, তুমি কি স্বেচ্ছায় সাধুকে কন্যা দিয়েছ?'

এবার সে জবাব দিল, "হাঁ।"

"কেন?"

উত্তর নাই। সহস্র রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়াও ওই "কেন"টার উত্তর পাওয়া গেল না।

বিরজা দেবী বলিলেন, "তাহলে কি বুঝবো আমরা ওই তার পিতা? হাঁ কি না—স্বীকার কর।"

যমুনা নির্ব্বাক।

ক্লান্তস্বরে বিরজা দেবী বলিলেন, "জানি, তুমি সাহস করে সত্য কথা বল্‌তে পার না, তোমার সব লুকোচুরি, সব ছলনা। কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যৎ বল্‌তে একটা কথা আছে, সেটা ভেবেছ? নির্ব্বোধ মেয়ে? কি উদ্দেশ্যে তুমি ওই ভণ্ডটার হাতে মেয়ে দিলে?"

নত মুখে যমুনা জবাব দিল, "উনি ভণ্ড নন।"

জ্বলিয়া উঠিয়া বিরজা দেবী বলিলেন, "সাধু, সাচ্চা, মহাপুরুষ—না! তোমার কাছে, আমাদের কাছে নয়। যিনি ভুলিয়ে তোমায় পাপের পথে এনেছিলেন—"

"ভুলিয়ে নয়, ভুল সাধন প্রণালীর দোষে।"

চমকিয়া করুণা দেবী বলিলেন, "তারই ফল ওই সন্তান?"

অস্পষ্ট স্বরে যমুনা বলিল, "হাঁ। অনুতপ্ত গুরুর ঊর্দ্ধগতি আজ কর্ত্তব্যের আকর্ষণে রুদ্ধ। নিজের গতি মুক্তির জন্য তিনি ওকে নিয়ে গেলেন, কর্ত্তব্যের খাজনা শুধতে।"

রুষ্ট স্বরে বিরজা দেবী বলিলেন, "রাখো ওসব বড় বড় কথা। ঊর্দ্ধগতি! আগে অধোগতির ফাঁড়া কাটুক তারপর! ঊর্দ্ধগতি এখন অনেক দূর! তোমার মত নির্বোধ আহাম্মক মেয়েরাই ওই সব প্রতারকদের কুহকের ফাঁদে পড়ে মরে! এখন মেয়েটাকে ফিরিয়ে পেতে চাও? তাহলে বল তার ঠিকানা।"

যমুনা নির্ব্বাক, অটল, দৃঢ়। লক্ষ প্রশ্নেও কোন জবাব দিল না।

কয়েক দিন পরে একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, আশ্রম হইতে যমুনাও অদৃশ্য!

বিজ্ঞ লোকেরা বলিলেন, "চন্দ্র ঘুরপাক খায় পৃথিবীর চারিদিকে, পৃথিবী ঘুরপাক খায় সূর্য্যের চারিদিকে!"

অনেক চেষ্টাতেও যমুনা, তাহার কন্যা বা সাধুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আশ্রমের মেয়েরা আতঙ্কিত, বিরজা দেবী ক্ষুব্ধ, করুণা দেবী ব্যথিত হইলেন।

আশ্রমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় জজ্ শিবলালবাবু নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতায় পাইপ টানিতে টানিতে প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "Crime is common, তাতে লঘুচিত্ত লোকেরা কুৎসা আন্দোলন করে খুশী হতে চায়—হতে দাও।"

ক্ষমতার জয়

১

মাঘ মাস। কয়দিন আকাশ মেঘলা হইয়া আছে। দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইয়াছে। মানভূমের প্রচণ্ড পাহাড়ে শীত অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

রাত্রি তখন একটা। বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া আরামে শুইয়া আছি। সমস্ত দিন সরকারী হাসপাতালের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, অবসাদক্লান্ত দেহটা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। গভীর আরামদায়ক তন্দ্রা ধীরে ধীরে জমিয়া আসিতেছে।

সহসা সদর দুয়ারের কড়া নড়িয়া উঠিল। হেড্ কম্পাউণ্ডার চন্দ্রনাথের স্বভাব-কর্কশ কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "বাবু, ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির উঠুন।"

সুখময় তন্দ্রাটি একলাফে—বোধ করি সাধুভাষায় যাহাকে বলে স্বর্গারোহণ, তাই করিলেন। ডাক্তারির ঝকমারিকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া অতি দুঃখে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। জানালা খুলিয়া বলিলাম, "কি হে, কি খবর?"

রাস্তা হইতে চন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "হাসপাতালে একটা সাংঘাতিক জখ্‌মি কেস্ এসেছে। চট্ ক'রে আসুন।"

জখ্‌মি কেসের অবস্থা যতই সাংঘাতিক হউক, নিজের অবস্থা ভাবিয়া বড় কম দুঃখ হইল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, "ইহাই চিকিৎসক-জীবনের ব্রত।"

আমাদের কথার শব্দে ছোট ছেলেটির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সানুনাসিক সুরে কান্না জুড়িল। সুতরাং স্ত্রীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি জামা জুতা পরিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হ'য়েছে ?"

উত্তর দিলাম, "হাসপাতাল যাচ্ছি। একটা জখ্‌মি কেস্ এসেছে।"

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া আমার গৃহীত ব্রত সম্বন্ধে এমন একটা শ্রুতিকটু বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন, যাহা শুনিতে পাওয়া কোন চিকিৎসকের পক্ষে শ্রুতি-সুখকর নয়। ইচ্ছা হইল, খুব একটা কড়া জবাব দিই ! কিন্তু সেই দুপুর রাতে বাহিরে জখ্‌মি রোগী ফেলিয়া ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে বাজে কথার প্যাঁচ লড়িয়া কুরুক্ষেত্র বাধানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে দুঃসাহস প্রকাশ করিলে ছেলে-মেয়ে সব কয়টির ঘুম ভাঙ্গিবে, এবং তজ্জনিত চ্যা-ভ্যাঁ চীৎকার উপদ্রবের আশঙ্কা যথেষ্ট।

গায়ে মোটা কোট চড়াইয়া, জুতার ফিতা বাঁধিয়া ষ্টাথিস্‌কোপ্ লইয়া নীরবে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে চন্দ্রনাথ লণ্ঠন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া উত্তেজনা-রক্ত মুখে বলিল, "চাঁদজোড় কোলিয়ারীর ছোট ম্যানেজার অটলবাবুর পায়ে কে তীর মেরেছে। ডান পায়ের ডিম্‌টা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'য়ে তীর বিঁধে র'য়েছে। এখনি অপারেশন কর্‌তে হবে।"

কোলিয়ারীর শ্রমিকদের মধ্যে 'গায়ের জোর' নামক ঔদ্ধত্যের বড়াই নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার নয়। কাজেই সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, নানাবিধ কুৎসিত উত্তেজনা-মূলক কাণ্ডের নিত্যনৈমিত্তিক উৎসব লাগিয়া আছে। ইহা তাহাদের সমাজে এমন গর্ব্বের বিষয় যে, শুধু পুরুষেরা নয়, উহাদের স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগিনীরাও তাহাতে মহোৎসাহে যোগদান করে। কোন কারণে এই দুর্দ্ধর্ষ 'মালকাটা'

সম্প্রদায়ের বিরাগ-দৃষ্টিতে পড়িলে,* শুধু কোলিয়ারী সম্পর্কিত বাবুরা নহেন, সাহেব সুবারাও মধ্যে মধ্যে উত্তম-মধ্যম লাভ করেন। সুতরাং ইহাদের সংস্রববর্ত্তী একজন পদস্থ বাঙালী ভদ্রসন্তানের পা বাণবিদ্ধ হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, "যে তীর মেরেছে, সে কি ধরা পড়েছে?"

সেই কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথির অন্ধকার মধ্যে এদিক ওদিক তাকাইয়া, চন্দ্রনাথ সন্তর্পণে চুপি চুপি বলিল, "না। কিন্তু এর মধ্যে কি যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে। মনে হয়, অটলবাবু কি-একটা কথা চেপে নিচ্ছেন।"

অকাল সুপ্তিভঙ্গে একে মাথা ধরিয়া গিয়াছিল, তার উপর চন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত 'রহস্যে'র গন্ধ মা মনসার উৎসৃষ্ট ধূনার ধোঁয়ার মত তুষ্টিদায়ক বোধ হইল! রাগ করিয়া বলিলাম, "তোমার নবেলিয়ানা রাখ বাপু! এর মধ্যে রহস্য আবার কি থাকবে? ভদ্রলোক চেপেই বা নেবেন কি? হয়ত কুলি-ঠেঙানো, নয়ত মজুরি কাটা—রাগের মাথায় তারাই কেউ দুশমনি ক'রে থাকবে। কোলিয়ারীতে এসব ত প্রায়ই হচ্ছে।" কথা কহিতে কহিতে আমরা হাসপাতালে পৌঁছিলাম।

অটলবাবু সুন্দর সুপুরুষ পূর্ববয়স্ক যুবা। অল্পদিন হইল তিনি চাঁদজোড় কোলিয়ারীর দ্বিতীয় ম্যানেজার হইয়াছেন। লোকটি বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যকুশল। কথা-বার্ত্তা আচার-ব্যবহার অতি ভদ্র। কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহাদের কোলিয়ারীতে একটা প্রকাণ্ড কয়লার চাপ খসিয়া জন কয়েক কুলি হতাহত হয়। সেই দুর্ঘটনা ব্যপদেশে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। লোকটীর মধ্যে সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার জোর ঘটনাক্ষেত্রে বিশেষরূপে দেখিয়াছিলাম বলিয়া, মনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাবহ স্মৃতি জাগিয়াছিল। সেই ভদ্রসন্তানটির আজ গুপ্ত-শত্রুহস্তে নির্য্যাতন দেখিয়া প্রাণে বেদনা বোধ হইল।

অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই সুন্দর মুখ উৎকট যন্ত্রণায় নীল হইয়া গিয়াছে। অসাধারণ মানসিক শক্তিবলে তিনি নিঃশব্দে তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু অবরুদ্ধ ক্লেশে অস্বাভাবিক ভাবে সর্ব্বাঙ্গের পেশী বার বার সঙ্কোচবিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। চোখের প্রান্ত বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু গড়াইতেছে। রক্তে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।

ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অনেকগুলা শিরা ও পেশী ভেদ করিয়া তীরটা পায়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। সহকারীদের ইঙ্গিত করিলাম, "সত্বর অস্ত্রোপচারের আয়োজন কর।"

ক্লোরোফরম্ করিয়া অনেকখানি মাংস কাটিয়া তীরটা বাহির করিলাম।

ধীরে ধীরে ক্লোরোফরমের নেশা কাটিয়া আসিতে লাগিল। বাক্‌শক্তি সচেতন হইয়া আসিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া অটলবাবু যন্ত্রণা-পীড়িত স্বরে নেশার ঝোঁকে অস্ফুট কণ্ঠে নিজ মনে বলিতে

লাগিলেন, "চিনি নি কি? চিনেছি! কিন্তু এ দুর্ব্বুদ্ধি ত তার চিরদিন। এ ইতরামির কথা লোকের কাছে প্রকাশ কর্‌ব কি ক'রে? বংশের কলঙ্ক যে! ওঃ জগদীশ্বর, ওকে দুষ্কার্য্য থেকে বাঁচাও!"

এ কি অসম্বন্ধ প্রলাপ? চিন্তিত হইলাম। তীরটা বিষাক্ত ছিল কি না সন্দেহ হইতে লাগিল।

সযত্নে তাঁর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রাণপণ সতর্কতায় সময়োপযোগী ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিতে মন দিলাম।

পরে প্রমাণ হইল, বেশী না হইলেও তীরটা বিষাক্ত ছিল। শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান্ যুবার দেহ, তাই রক্ষা! চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষের কার্য্যকরি শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

কয়েকদিন হাসপাতালে রাখিয়া সঙ্কটজনক অবস্থাটা কাটাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে পাঠান হইল। আমি ও চন্দ্রনাথ প্রথমে নিয়মিত রূপে প্রতিদিন গিয়া ক্ষত পরিচর্য্যা করিয়া আসিতাম। পরে চন্দ্রনাথ একা যাইত। প্রায় দেড় মাস ভুগিয়া ভদ্রলোক আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহত পা-খানি চিরদিনের জন্য একটু খঞ্জ হইয়া রহিল। ইহার মধ্যে যথারীতি পুলিশের হাঙ্গামা হইল; কিন্তু মূল অপরাধী ধরা পড়িল না।

শোনা গেল, অটলবাবুর অবহেলাপূর্ণ জবানবন্দীতে মোকদ্দমা পণ্ড হইয়াছে। তিনি না-কি বলিয়াছেন যে, ছোট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি রাত্রে একা বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি যখন আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন অন্ধকারে কোথা হইতে হঠাৎ একটা তীর আসিয়া তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হয়। তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভৃত্যেরা আলো লইয়া ছুটিয়া আছে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া যায়। কে কোথা হইতে তীর ছুড়িয়াছিল, তিনি বলিতে পারেন না।

তাঁহার শত্রু কেহ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি কাহাকেও সন্দেহ করিতে অনিচ্ছুক।

অটলবাবু সুস্থ হইবার পর কিসের জন্য জানি না, পুলিশ সহসা শান্ত হইল। আর কোন গোলমাল শোনা গেল না। কিন্তু শুনিতাম আমাদের চন্দ্রনাথ অন্তরালে তাহার সঙ্গী-সাথাদের কাছে ওই ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ভয়ানক অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। চাপা গলায়, ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিত, "অটলবাবু কাপুরুষের মত ভয়ে ছেড়ে দিলেন, এটা নেহাৎ অন্যায় হ'ল। এ লোক প'ড়ে মার খাবে না ত খাবে কে? হ'ত আমাদের ময়মনসিং জেলা, তা' হ'লে—"

তাহা হইলে বীরদর্পে সে যে কাণ্ড করিত, সেটা ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার ওজন ঠিক রাখিয়া পাকা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হইত কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সরকারী শাসনবিভাগের কর্ত্তাদের কানে সে আস্ফালনের সংবাদ পৌছিলে, হয়ত তাঁহারা ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের কোন এক বিশেষ ধারা চন্দ্রনাথের উষ্ণ মস্তিষ্কের উপর জারি করিতেন। সরকারী হাসপাতালের ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের আইন-জ্ঞানের অভাব, কাজেই তাহারা বিনা দ্বিধায় চন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করিত। তাহাদের মধ্যে কে কবে কোথায় কিরূপে অনিষ্টকারী শত্রুনির্য্যাতনে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার বিবরণ সোৎসাহে বর্ণনা করিত।

পাশের ঘরে নিরীহ চিকিৎসক আমি, অবকাশকালে চুরুট টানিতে টানিতে নীরবে তাহাদের আলোচনা শুনিতাম। বুঝিতাম, আহত অটলবাবুকে ড্রেস করিতে গিয়া, তাঁহার আততায়ী সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যেরূপে হউক অনেক কিছু গুপ্ত সংবাদ শুনিয়াছে। হয়ত সে সংবাদগুলার কোন ভিত্তি নাই, হয়ত বা আছে। কিন্তু অটলবাবু যখন স্বেচ্ছায় আততায়ীকে নিষ্কৃতিদানে ইচ্ছুক, তখন চন্দ্রনাথের অনধিকার-চর্চ্চা কেন?

কিন্তু অটলবাবু ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝিতে পারি না। মনে সংশয় জাগে। ক্লোরোফরমের নেশায় তাঁহাকে প্রলাপ বকিতে শুনিয়াছি, তাহা মনে পড়ে—আর মনে পড়ে যখন বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম, তখনকার কথা! গুপ্ত ঘাতকের কথা উঠিলেই তিনি মুখ ফিরাইয়া দেওয়ালের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া থাকিতেন! দেখিতাম দেওয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে বোনা ছোট একটি কবিতা টাঙানো রহিয়াছে :—

"যে পারে অপরে আছাড়ি ফেলিতে
সে ত বলবান নয়।
অপকারী জনে, যে পারে ক্ষমিতে
তারি ক্ষমতার জয়॥"

শ্রুতিমধুর নীতি-কথা! কিন্তু প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অপরাধীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা, বাস্তবক্ষেত্রে কয়েকজনের দেখিয়াছি, মনে পড়ে না। ভদ্রলোক কি এতই সেন্টিমেণ্টাল?

সুতরাং সন্দেহ শুধু সন্দেহ মাত্রই রহিয়া গেল!

৩

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার ঠিক তেমনি মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রি। রাত্রের আহার সারিয়া সবেমাত্র উঠিয়াছি, এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "চাঁদজোড় কোলিয়ারী থেকে ডাক এসেছে।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম মোটর লইয়া স্বয়ং অটলবাবু উপস্থিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে গভীর বিষাদের ছায়া।

প্রশ্ন করিলাম, "কার অসুখ? আপনার বাড়ীতে নাকি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমার বাড়ীর কাছেই। আমার এক জ্ঞাতি ভাই কোলিয়ারীতে চাকরী করেন, তাঁরই অসুখ।"

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, লোকটি কিছুদিন হইতে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কে এক হাতুড়ে চিকিৎসক বন্ধু সে-ব্যাধি কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া অবহেলাভরে যথেচ্ছ চিকিৎসা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তার উপর নিউমোনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তাও চিকিৎসক-প্রবরের বিজ্ঞতায় প্রথমটা অবহেলিত হইয়াছে। এখন রোগীর সংজ্ঞালোপ হইয়াছে, অবস্থা সঙ্গীন।

অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া আসিবার জন্য চন্দ্রনাথের নিকট চাকর পাঠাইলাম। জামাজোড়া পরিয়া নিজে অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া আসিলাম। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিস বহিয়া আনিয়া শোফারের পাশে বসিল। নবেলিয়ানা এবং গোঁয়ার্তুমির দোষ যতই থাক, কাজের সময় চন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটপটে হুঁসিয়ার বলিয়া এসব ক্ষেত্রে আমি সকলের আগে তাহাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিতাম।

সমস্ত জিনিসপত্র ঠিক লওয়া হইয়াছে কি না, তার হিসাব পরীক্ষা শেষ হইলে চন্দ্রনাথ বলিল, "কার অসুখ মশাই?"

ম্লান মুখে অটলবাবু বলিলেন, "আমার এক ভাইয়ের।"

আর কথাবার্ত্তা হইল না। মোটর সশব্দে ধাবিত হইল। চুরুট ধরাইয়া রোগীর সম্বন্ধে অটলবাবুকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। শুনিলাম রোগী তাঁহার সমবয়স্ক, খুব শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে এই কোলিয়ারীতে কুলী-সংগ্রাহকের কার্য্য করিতেছিলেন, কাজটা অটলবাবুর অনুগ্রহেই জুটিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, লোকটির বিদ্যাবুদ্ধি ছিল কম এবং প্রবৃত্তি ছিল অতি হীন।

কুসংসর্গে মিশিয়া কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া, কুৎসিত ব্যাধির বিষে শরীর জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লোকটির সন্তানাদি কয়েকটি হইয়াছিল, কিন্তু পিতৃকৃত পাপব্যাধির ফলে তাহারা অকালে মারা গিয়াছে। এখন সংসারে আছে তাঁহার শুধু চিররুগ্না স্ত্রী এবং হতভাগিনী মাতা।

নীরবে চুরুট টানিতে লাগিলাম। ভগবানের রাজ্যে পাপানুষ্ঠান করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও পরিত্রাণ পাইতে দেখিলাম না। কলেজে পড়িবার সময় স্বাধীনচিত্ততা প্রমাণের জন্য নাস্তিক্যবাদ কপ্‌চাইতাম। কুতর্কের আস্ফালনের তাল ঠুকিয়া ভূত-ভগবান সব উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন দেখিয়া এবং ঠেকিয়া দিনে দিনে জ্ঞানলাভ করিতেছি।

যথাস্থানে গিয়া গাড়ী থামিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম।

সামনে একটা বাড়ীর দুয়ারের কাছে কতকগুলা কুলি-মজুর শ্রেণীর লোক বসিয়া, রাস্তার পাশে খড়কুটা জড় করিয়া আগুন জ্বালিয়া তাপ লইতেছিল। তাহারা শশব্যস্তে উঠিয়া অটলবাবুকে নমস্কার করিল।

অটলবাবু তাহাদের বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর খবর দাও। ডাক্তার এসেছেন। এখন অবস্থা কেমন?"

তাহারা যাহা উত্তর দিল তার সার মর্ম্ম এই—রোগীর অবস্থা এখন সেই রকমই। তবে চোখে আরও ঘোলা পড়িয়াছে। জিভ আরও এড়াইয়া গিয়াছে, প্রলাপের জোর আরও বাড়িয়াছে।

বুঝিলাম—অবস্থা সেই রকম নয়। রকম আরও খারাপ।

চন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া সহসা চমকিয়া উঠিলাম! ইহার হইল কি? উদ্বেগ-বিবর্ণ মুখে, প্রথম চঞ্চল দৃষ্টিতে সে বার বার সেই বাড়ীর দুয়ারের দিকে এবং অটলবাবুর মুখের দিকে চাহিতেছে কেন?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। চন্দ্রনাথ ঢোক গিলিয়া বলিল, "এ বাড়ীতে কার অসুখ?"

অটলবাবু বলিলেন, "আমার এক জ্ঞাতি-ভাইয়ের।"

রুদ্ধশ্বাসে চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল, "যিনি কুলিদের রিক্রুটার বাবু?"

অটলবাবু বলিলেন, "হাঁ।"

চন্দ্রনাথ শুম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। অতর্কিতে তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড দমকের সহিত নির্গত হইল, "ওঃ!"

ভিতর হইতে লোক আসিয়া ডাকিল, "আসুন।" হতবুদ্ধি চন্দ্রনাথের পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "চল হে!"

৪

ভিতরে গিয়া শয্যাশায়িত সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চমৎকার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ! আক্ষেপ হইল—সদাচারে জীবন যাপন করিলে এই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের অধিকারী নিঃসন্দেহে দীর্ঘজীবী হইতেন।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দেহের সব যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। জীবনীশক্তি তখন নিঃশেষপ্রায়। সময় থাকিতে সুচিকিৎসা ও সুনিয়ম-পালন হইলে, হয়ত কিছু করা যাইত, কিন্তু এখন আর কিছু করিবার সময় নাই। রোগীর বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া বলিলেন যে, রোগীর বন্ধু ডাক্তারটি অতিশয় বিজ্ঞ। তিনি চিরকাল ইহাদের পারিবারিক চিকিৎসকরূপে কত রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন। রোগীর এবারের অসুখেও বরাবর বলিয়াছেন, "কোন ভয় নেই, এ রোগ কিছুই না।" রোগীও তাই বুঝিয়া আর কোন চিকিৎসককে ডাকিতে দেন নাই। যথেচ্ছাচারী রোগীর কর্ত্তৃত্বই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। আজ

অচৈতন্ত রোগীর আর কোন কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া, তিনি ও তাঁহার পুত্রবধূ কান্নাকাটি করিয়া অটলবাবুকে সংবাদ দিয়াছেন। অটলবাবু তৎক্ষণাৎ আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়াই আমাদের আনিতে গিয়াছিলেন। এখন আমরা যদি—

নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিলাম। কোন আশা-ভরসার কথা বলিয়া মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগের যন্ত্রপাতি গুছাইতে গুছাইতে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "রোগীর যথেচ্ছাচারের পৃষ্ঠপোষক কোলিয়ারীর সেই কুলি-হন্তারক বিজ্ঞ চিকিৎসকটি এ সময় গেলেন কোথায় ?"

একজন উত্তর দিল, "বারো ক্রোশ দূরে একটা ফলারের নিমন্ত্রণ আছে, সেইখানে ছুটেছেন।"

কোলিয়ারীর একজন চাপরাশী রসিকতা করিয়া আর একজন চাপরাশীর উদ্দেশে অস্ফুটস্বরে বলিল, "লুচির নিমন্ত্রণ থাকলে বামুন আঠারো ক্রোশ ছুট দিতেন।"

চন্দ্রনাথ গভীরতর ক্ষোভের সহিত বলিল, "দেব-দ্বিজে ভক্তি রাখবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই সব ব্রাহ্মণদের রকম সকম দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছি মশাই। আমার ক্ষীণজীবী ভক্তির পরমায়ু বুঝি আর টেকে না।"

মনে মনে বলিলাম, দোষারোপ বৃথা। অকাল-মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার পক্ষে মানুষের নিজের দুর্মতিই যথেষ্ট। সে দুর্মতির পৃষ্ঠপোষকতা করিবার লোক তাহারা নিজেরাই খুঁজিয়া লয়। সে চিকিৎসকটি নিমিত্তের হেতু মাত্র।

ব্যর্থ জানিয়াও শেষ চেষ্টা যথাসাধ্য করিলাম। কিন্তু সব বৃথা। গভীর রাত্রে রোগীর মৃত্যু হইল।

শুনিলাম সৎকার করিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। হিসাব করিয়া দেখা গেল, অটলবাবুর শ্যালক ও অটলবাবু ছাড়া মৃতের স্বজাতি কায়স্থ-সন্তান আমি ও চন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত আছি। চিকিৎসকের সজ্জা ছাড়িয়া অগত্যা শববাহকের বেশ ধরিলাম। মৃতের শোকার্ত্তা মাতা ও পত্নীর কাছে অটলবাবুর স্ত্রী ও ভগিনীকে রাখিয়া আমরা শেষ রাত্রে শব লইয়া শ্মশানে চলিলাম। সঙ্গে আলো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া জনকয়েক কুলি ও চাপরাশী চলিল।

শ্মশান অনেক দূরে। মৃতের শোকাহতা স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। অটলবাবুই শবের মুখাগ্নি করিতে প্রস্তুত হইলেন।

চিতা সাজাইয়া শব চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। অটলবাবু অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

গভীর মর্ম্মব্যথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর তখন কাঁপিতেছিল। মনে হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরা সেই মঙ্গল-প্রার্থনা, যেন মূর্ত্ত সজীব হইয়া দ্রুত চঞ্চল অগ্নিমুখে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

মনে মনে আমিও শ্রীভগবানের চরণে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিলাম।

পিছন ফিরিয়া দেখি, আমাদের ময়মনসিংহের দুর্ধর্ষ-প্রতাপ, নির্ম্মম ন্যায়পরায়ণ চন্দ্রনাথ, দীনহীন কাঙ্গালের মত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে অগ্নিকর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া, অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে!

জানি সে ভাব-প্রবণ যুবা। তবু এতটা আশা করি নাই। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিদান করা হইল। চিতা জ্বলিয়া উঠিল; অটলবাবু খঞ্জ চরণে

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া শ্রান্তভাবে চন্দ্রনাথের পাশে বসিলেন। ব্যথাহত কণ্ঠে ডাকিলেন, "চন্দ্রবাবু!"

চন্দ্রনাথ সাশ্রু নয়নে তাঁহার দু'হাত চাপিয়া ধরিল। আবেগভরে বলিল, "আপনার খোঁড়া পায়ে তাঁর শত্রুতার চিহ্ন চিরদিনের মত রইল। আপনি যদি সেদিন ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতেন, তা হ'লে হয়ত তাঁর পাপের ভার লঘু হ'য়ে যেত। হয়ত তাঁর এমন ভাবে ভরাডুবি হ'ত না। ঈশ্বর জানেন! অত্যাচারীর দুষ্কার্য্য আপনি সেদিন স্বেচ্ছায় গোপন করেছিলেন ব'লে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভীরু, কাপুরুষ! মূঢ় আমি! সেদিন অন্যায়ের অত্যাচারে ভয়ানক অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ দেখছি, ক্ষমার অত্যাচার তার চেয়ে শতগুণ ভয়ানক! এ যেন সহ্য করা যায় না।"

নিশ্বাস ফেলিয়া অটলবাবু বেদনাক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন, "মানুষ মাত্রেই অনেক ভুল ক'রে থাকে! নির্ব্বোধের ভুলের জন্য ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য!"

ব্যস, আর কিছু নয়! স্তম্ভিত হইয়া একবার সেই শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার দিকে—একবার অটলবাবুর খঞ্জ চরণের দিকে চাহিলাম। এতদিনের পর চন্দ্রনাথের কথিত সেই 'রহস্য' আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, কেন, কিসের জন্য এ অত্যাচার? স্পষ্ট বুঝিলাম, যে-কুবুদ্ধি ওই হতভাগ্যকে আজ নিজের অকাল মৃত্যু নিমন্ত্রণে বাধ্য করিয়াছে, সেই কুবুদ্ধিই একদিন পরশ্রীকাতর হইয়া, হিংস্র উন্মাদনায় নিরীহ জ্ঞাতি-ভ্রাতার মৃত্যু ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছিল! জগদীশ্বর নিরপরাধকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অপরাধী—যত গোপনেই অপরাধ করুক, তাঁহার বিচারে পরিত্রাণ পাইল না! আশ্চর্য্য তাঁহার বিধান!

অটলবাবুর ক্ষমাসুন্দর বেদনার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিনের পর আজ সেই কার্পেটে বোনা কবিতার শেষ ছত্র দু'টা মনে পড়িল :

'অপকারী জনে, যে পারে ক্ষমিতে
তারি ক্ষমতার জয় !'

পাহাড়ের পথে

১

কার্ত্তিক মাস। মাসের শেষা-শেষি অকস্মাৎ অকালে বর্ষা দেবী অহৈতুকী-মমতায় প্রবল বর্ষণ সুরু করিয়া গরীব কৃষিজীবিদের পাকা ধানে 'মই' দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আকাশের কোলে ছাই-রঙের ময়লা চেহারার মেঘ-গুলার ছুটা-ছুটি কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগতই চলিতেছিল। রৌদ্রালোকের অভাবে চারিদিকের গাছ-পালার সবুজ রং, ধোঁয়োটে মলিন কুয়াসা-ঢাকা নিরানন্দতায় যেন থম্-থম্ করিতেছিল। দূর হইতে পাহাড়গুলাকে ময়লা কাগজের পিঠে পেন্সিলে আঁকা ছবির মত অস্পষ্ট ম্লান দেখাইতেছিল। মাঝে-মাঝে দূর হইতে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ ভাসিয়া আসিয়া পাহাড়ের মাথায় জড়াইয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কে যেন এক রাশ তুলা ধুনিয়া, ধূম্র পাহাড়ের মাথায় সযত্নে হাল্কা তুলার মুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

কয়দিন এই অবস্থায় চলিবার পর আজ হঠাৎ প্রকৃতি দেবীর খেয়াল বদলাইয়াছে। সকাল হইতেই মেঘ কাটিয়া সূর্য্যদেব কড়া মূর্ত্তিতে বিমান-পথে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন; চারিদিকে মানুষ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

পঞ্চকোট পাহাড়, পূর্ব্ব দিকে মাথা উঁচাইয়া, পশ্চিম দিকে লেজ গুটাইয়া একটা বিরাটকায় ঐরাবতের মত পৃথিবীর বুকে জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। পাহাড়ের পাদমূলে ছোট-ছোট সাঁওতাল ও বাউরী-

পল্লীগুলি গাছ-পালার আওতার আড়ালে অদৃশ্যপ্রায়। নিতান্ত চুঁড়িয়া না দেখিলে তাহাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।

বৃষ্টির জলে বালি-মাটি ধুইয়া, সেই পল্লী-পথগুলির পাথর চুঁচালো মূর্ত্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে খুব খানিকটা জল কাদা জমিয়া আছে, তাই খালি-পায়ে বিচরণশীল পথিকরা কোন রকমে সেই কাদা পায়ে লেপ্টাইয়া কষ্টে-সৃষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে।

এমনি একটা নির্ম্মম কর্কশ পথ ধরিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের ঝোপ-ঝাপ সমাকীর্ণ একটি ছোট সরু পথের কাছে আসিয়া দুটি মানুষ দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন, মাল-কাটা মহলের বিখ্যাত চিকিৎসক, লক্ষ্মীকান্ত কবিরাজ, অপর ব্যক্তি তাঁহার 'মাইন্দার'—অর্থাৎ বেতন-ভোগী ভৃত্য প্রসাদ বাউরী। প্রসাদের কোমরে একটা কাটারী, কাঁধে একটা শূন্য ঝুড়ি। ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলা পার্ব্বত্য উদ্ভিদের দরকার পড়িয়াছিল, তাই কবিরাজ মহাশয় আজ সভৃত্য পাহাড়ে চলিয়াছেন। পাহাড়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের গাছ অনেক পাওয়া যায়।

কয় দিনের বর্ষায় পাহাড়ের জল-নিকাশের পথগুলা আজ সদ্য-ধোয়া, বড় পরিষ্কার। এখনো কোন কোন পথ বহিয়া মৃদু স্রোতে জল-ধারা বহিয়া আসিতেছে, কোন পথ একেবারে শুষ্ক। এই পথগুলি ভাঙা-চোরা এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু বহুবিধ চেহারার পাথরের ঠাসে তৈরী। মাঝে মাঝে দেড় হাত দু'হাত কিম্বা তার চেয়েও উঁচু পাথরের চাঙড়, উদ্ধতভাবে ঘাড় উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহারা পর্ব্বতারোহীদের উদ্দেশে তাল ঠুকিয়া বলিতেছে—'রণং দেহি!' অথচ এই সকল নিষ্ঠুর-দৃশ্য পথ ছাড়া দুর্গম অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়ে উঠিবার পক্ষে নিরাপদ পথ আর নাই।

এমনি ধরণের একটি জলহীন জল-নিকাশের পথ বাছিয়া লইয়া

কবিরাজ মহাশয় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পিছনে প্রসাদ চলিল। খানিকটা করিয়া কবিরাজ মহাশয় এদিক ওদিক খুঁজিয়া সংগ্রহ-যোগ্য লতা, গুল্ম, গাছের ছাল, ডাল, শিকড় প্রসাদকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; প্রসাদ কাটারীর সাহায্যে সে গুলি কাটিয়া-কুটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় সেই অবসরে ধীরে সুস্থে ছাতি মাথায় দিয়া আরও খানিক উপরে উঠিয়া, অন্যান্য গাছ-গাছ্‌ড়ার খোঁজ করিতে ছিলেন। এইরূপে উদ্ভিদ সংগ্রহ চলিতে লাগিল।

একটা বড় গাছের তলা খুঁড়িয়া খানিকটা শিকড় সংগ্রহ করিতে সেবারে প্রসাদের বড় বিলম্ব হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় তখন অনেকটা উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। প্রসাদ ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া একবার উপর দিকে চাহিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে পাইল না, অগত্যা তাড়াতাড়ি পাথর টপ্‌কাইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিল। অনভ্যস্ত লোকদের পক্ষে পাহাড়ে উঠিবার পথ কষ্টকর হইলেও এ-দেশের বলিষ্ঠ সাঁওতাল ও বাউরী যুবকরা এ পথে বেশ সহজ ভাবেই ওঠা-নামা করে।

লম্বা-লম্বা পা বাড়াইয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ পাথরের পাশে একটা ঝোপের দিকে নজর পড়িতেই প্রসাদ বাউরী থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটি বাউরীর মেয়ে হেঁট হইয়া কাঠ কুড়াইতেছিল। তার পরণে একখানি চটের মত পুরু দেশী-তাঁতের মজবুত কাপড়; কাপড়খানি যেমনি ময়লা, তেমনি দুর্গন্ধে ভরপুর! দেশীয় প্রথানুসারে এ সব কাপড় কচিৎ ক্ষার বা সাবানের স্পর্শলাভে ধন্য হয়, কারণ এই দরিদ্র বেচারীদের অধিকাংশেরই একখানার বেশী দু'খানা কাপড়ও থাকে না এবং তাহা পরিষ্কার করিবার অবকাশও বড় জুটে না। একখানা

মাত্র কাপড়েই ইহারা দিনের পর দিন, বেশ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে কাটাইয়া দেয়। স্নানের সময় এই কাপড় খানি বদলাইয়া একটি ছেঁড়া-খোঁড়া যা-হোক কিছু পরিয়া কোন গতিকে স্নানটা সারিয়া লয়, তারপর আবার সেই এক কাপড়ই পড়ে।

প্রসাদ বিস্মিতভাবে ক্ষণেক মেয়েটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে কাঁধের ঝুড়ি নামাইয়া নিকটস্থ পাথরের উপর রাখিল। তার পর সেই ঝোপের দিকে অগ্রসর হইয়া মানভূমের বিশিষ্ট টান-যুক্ত বাংলা ভাষায় ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে বলিল "ভেলে অলোগণো! পাব্বতি! তু ইহানে—"

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। তার ম্লান তারুণ্যের স্নিগ্ধ-শ্রী মাখান বিষাদ-মলিন মুখে চকিতের জন্য একটু আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আত্ম দমন করিয়া সংযত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "হঁ"— অর্থাৎ 'হাঁ আমিই বটে!"

সে আবার মাথা হেঁট করিয়া নিজের কাজে মন দিল, যেন এ লোকটার উপস্থিতি অনুপস্থিতি তার পক্ষে সমান নিষ্প্রয়োজনীয়!

এইখানে ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। খুব ছোট বয়সেই প্রসাদের মা, পার্ব্বতীর সহিত প্রসাদের বিবাহ দিয়াছিল, এবং খুব সকালেই অর্থাৎ তের বৎসর বয়সে পার্ব্বতীর একটি সন্তান হইয়া অকালে মারা যায়। তারপর পাঁচ ছয় বৎসর আর সন্তানাদি হয় নাই। এই সময় একদা কয়লার খাদে খাটিতে গিয়া প্রসাদ আর একটি স্বজাতীয় বাল-বিধবাকে দেখিয়া মোহিত হয়, কারণ সে মেয়েটি পার্ব্বতীর মত শান্ত নিরীহ নয়, রীতিমত প্রখর, চঞ্চল এবং চোট্‌পাট উত্তর দানে পরম তুরুস্ত, সুতরাং প্রসাদ মনে মনে বুঝিল, পার্ব্বতীর নিরীহ শান্ত-স্বভাবে তার গৃহে যে অন্ধকার জমিয়াছে, এই চঞ্চল মেয়েটির উজ্জ্বল স্ফূর্ত্তিবাজ প্রাণের

আলোয় তাহা দূর হইবে। অতএব নিঃসন্তানত্বের অপবাদ খণ্ডনের জন্য মেয়েটির পানিগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল; মেয়েটিরও সে-বিষয়ে আপত্তি দেখা গেল না। কারণ বাউরী-জাতির মধ্যে চেহারায় ও চাল-চলনে প্রসাদ বেশ একজন সর্দ্দার শ্রেণীর সুপুরুষ যুবক ছিল। সুতরাং উভয় পক্ষের মতানুসারে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে 'সাঙা' করিয়া প্রসাদ নববধূ বা 'লইতুনিকে' ঘরে আনিল।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নববধূর তাড়নায় অত্যন্ত কোণ-ঠাসা হইয়া পার্ব্বতী বেচারা কিছুকাল অতিকষ্টে স্বামীর ঘরে রহিল, কিন্তু বৎসরান্তে যখন নববধূর একটি পুত্র হইবার পর পার্ব্বতীরও একটি পুত্র হইল, তখন ক্ষোভে ঈর্ষ্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নববধূ অত্যন্ত উৎপাত বাধাইয়া তুলিল। প্রসাদ উদ্ব্যস্ত হইয়া দুই স্ত্রীকেই মার-ধোর করিয়া সাংসারিক শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিল, কিন্তু ফলে দু'জনেই, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষটি অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া সতীনের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার সুরু করিল। পার্ব্বতী কিছুদিন রহিয়া সহিয়া দেখিল, শেষে আর পারিল না। ছেলেটিকে লইয়া নিজের পিত্রালয়ে গিয়া খাটিয়া খাইতে সুরু করিল।

সতীন বিদায় হইল, নির্ব্বিবাদে স্বামী ও সংসারের উপর একছত্রী সম্রাজ্ঞী হইয়া কতকটা ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে নববধূ দিন কাটাইতে লাগিল। প্রথমা স্ত্রীর তিরোধানে প্রসাদের মনে দুঃখ শোক কি কতটা হইল, সে খবর কেহ জানে না, তবে দুই স্ত্রীর ঈর্ষ্যাজর্জ্জর সংসার-ধর্ম্মের তাড়নায় সে যে অনেকটাই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সে কথা অনেকেই বুঝিল এবং অধিকাংশ লোকই তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করিল। দু'একজন দুর্ম্মুখ, বড় বধূকে তাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রসাদের কৈফিয়ৎ চাহিলে প্রসাদ মুহূর্ত্তের জন্য গুম হইয়া থাকিত, তার পর নিশ্বাস ছাড়িয়া জোর গলায়

জবাব দিত, "কি কর্‌ব? *ছুটুকিটা বড়া লিয়াইয়া, বটেক!" অর্থাৎ ছোট স্ত্রীটি বড় ঝগড়াটে!

সুতরাং বড় বধূ সম্বন্ধে প্রসাদ উদাসীন থাকিতেই বাধ্য রহিল! লোকে বুঝিল, উপায় নাই!

২

বহুদিনের পর আজ এই নির্জ্জন পাহাড়-পথে দু'জনের সাক্ষাৎ! এর আগে পথে ঘাটে দু'একবার প্রসাদ পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইয়াছে, দু'একটা কুশল জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্তু পার্ব্বতী এমন নিষ্করুণ ক্ষোভে ও ঔদাসীন্যের সহিত পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে যে, প্রসাদের পক্ষে নিষ্ফল বেদনায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকা ব্যতীত উপায় থাকে নাই। লোক-লজ্জার ভয়, বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ স্ত্রীটির কাণে কথা উঠিবার ভয় প্রসাদের যথেষ্ট ছিল, সুতরাং পার্ব্বতীর মত শান্ত নিরীহ মেয়ের এই অবাধ্যতা সংশোধন করিবার ক্ষুদ্র সুযোগটুকুও সে হাতে লইবার সাহস করে নাই।

কিন্তু আজ এই নির্জ্জনে?···পূর্ব্বস্মৃতিগুলা প্রসাদের মনে পড়িল। তার মাথার ভিতর উগ্র রক্তস্রোত চন্‌-চন্ করিয়া উঠিল। প্রসাদ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ভারিথ্‌থি আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটো আছে কেমন?"

কুড়ানো কাঠগুলা এক স্থানে স্তূপাকার করিতে করিতে পার্ব্বতী সংক্ষেপে জানাইল, তার পুত্রটি ভাল নাই, আজ পাঁচ দিন আবার জ্বর হইয়াছে।

প্রসাদ গরম হইয়া বলিল, "খবর দিস্ নেই কেনে?"

পার্ব্বতী জবাব দিল না। প্রসাদ নিজের প্রশ্নের নিরর্থকতা বুঝিয়া একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "লইতুনির ডরে, না? তু ডরেই মলি। আরে তু—ও যে, সে—ও সে! এত ডর্ কিস্ কে?"

কথাটা আড়ালে দাঁড়াইয়া বলা সহজ, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো! পার্ব্বতী ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "হঃ। বড়া মরদ্ হইচেক্! তু উয়াকে ডরিস্ কিস্ কে?"

প্রসাদের পৌরুষমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। সে প্রথমে পার্ব্বতীকে গালি দিল, তারপর তার স্বপত্নীকে—শেষে সমগ্র স্ত্রীজাতির দুর্ব্বৃত্ততার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

এই মূর্খ মানুষগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম-মনোভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষা-সম্পদের অভাব যতই থাক, প্রসাদ রাগের মাথায় টানিয়া টানিয়া, অসম্পূর্ণ বিকৃত ভাষায় এমন কতকটা মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল, যার ফলে ক্রুদ্ধা পার্ব্বতী অধিকতর ক্ষুব্ধচিত্তে বুঝিতে বাধ্য হইল যে, প্রসাদ দায়ে পড়িয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেও—যথার্থ পক্ষে সে উদাসীন নয়! এখনও পার্ব্বতীর জন্য, বিশেষ করিয়া 'ছেলেটার' জন্য তার মন কাঁদিতেছে! কিন্তু সে নিরুপায়, কারণ তার দুঃখ বুঝিবার ত কেহ নাই—"মেয়্যা-জাতিটাই যে বড়া কঠিন!"

পার্ব্বতী রাম-মহিম কোন শব্দ উচ্চারণ করিল না; নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। প্রসাদ উত্তর প্রতীক্ষায় ক্ষণেক তার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া—হঠাৎ তার পাশে বসিয়া পড়িল, ক্ষিপ্রহস্তে সবলে তার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "পারবতি—আমি কি করব বল?"

এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য পার্ব্বতী কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। প্রথমটা সে অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে অনুভব

করিল—প্রসাদের কণ্ঠে যেমনি হতাশা-ভাঙা মিনতির সুর বাজিতেছে, তার বলিষ্ঠ বাহু যুগলের মাঝে ঠিক তার বিপরীত-ধর্ম্মী—উন্মত্ত আবেগের প্রবল বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝনা বহিয়া যাইতেছে! মুহূর্ত্তের জন্য পার্ব্বতীর যেন দম বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইল; সবলে প্রসাদের হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইল। কর্কশ তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ঘর্কে যা খালভরা! তু তোর লইতুনি লিয়ে রই-গে! ফির্ যদি ঘুরে আমার সাথে লাগ্‌বি ত—"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া পার্ব্বতী রাগভরা মুখে দ্রুত ফিরিল। অসমতল পথ বহিয়া পাহাড়ের নীচের দিকে নামিতে সুরু করিল। তার সংগৃহীত কাঠ কুটরাগুলা পড়িয়াই রহিল!

প্রসাদ মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণেই উন্মত্ত বাঘের মত কাঁটা-ঝোপ মাড়াইয়া বড় বড় পাথর টপ্‌কাইয়া তিন লাফে নামিয়া গিয়া পার্ব্বতীর সামনের পথে হাজির হইল। পাথরে ঠোক্কর খাইয়া, পায়ের চারিটা অঙ্‌গুল ছড়িয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল, সেদিকে প্রসাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বিজয়-গর্ব্বে ফিরিয়া, বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বলিল, "আয় ত দেখি, নামি আয়।"

পার্ব্বতী ক্ষণিকের জন্য থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তারপর রুষ্ট স্বরে বলিল, "সোজা সড়পে না যাতি দিস্, র' তু! আমি উপরি-হ্ উঠ্‌ যাব!"

সত্য সত্যই সে ফিরিয়া হরিণীর মত লঘু লম্ফে পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময় তাহাদের মাথার উপরের অদৃশ্য পর্ব্বত কক্ষ হইতে কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "পেসাদ হে—পেসাদ হে—"

এতক্ষণের পর কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্যটির স্মরণ হইল—সে প্রভুর কাবে

পাহাড়ে আসিয়াছে! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, প্রসাদ পর্ব্বতারোহণ রতা পর্ব্বতীর দিকে চাহিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "যাচ্ছিস্ যা। হোই হনুমান ধাড়ার হোথা টুগন্থ বসিস্—দুটো কথা আছে তোর সাথ্। আমার কিরা ছেলেটোর কিরা, শুনি যাস্।"

পার্ব্বতী হাঁ না কোন জবাব দিল না। নিজের পথে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। প্রসাদ নিশ্বাস ফেলিয়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাঁ দিকের একটা পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।

৩

ঘণ্টা দুই পরে প্রসাদ বাউরী ঝুড়ি মাথায় করিয়া পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সেখানে একটি ক্ষীণকায় জল-স্রোত পাহাড়ের বন-জঙ্গলের আড়াল দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বাহিরে আসিয়া আবার তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ের নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এইখানে জল-ধারাটির পাশে হাত-দেড়েক লম্বা-চওড়া পাথরের খোদাই করা একটি হনুমান মূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বৎসরের কোন একটি বিশেষ সময়ে এই জল-ধারা ও হনুমান মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া পাহাড়তলীর অধিবাসীরা ছোট-খাট একটি পর্ব্বোৎসব করে। এই স্থানটিকে লোকে হনুমান-ধারা বলিয়া থাকে। এরূপ আরও একটি ধারা পাহাড়ের আরও কিছু উপরে আছে। সেটি "গাই-ধারা" নামে বিখ্যাত। সেখানে বনচ্ছায়ায় একটি অন্ধকারময় পাথরের গহ্বর ভেদ করিয়া, হনুমান-ধারার অপেক্ষা কিছু প্রবল একটি জল-ধারা বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই জল-ধারার উৎপত্তি স্থানে পাথরটির গায়ে গরুর বাঁটের মত চারিটি বাঁট না কি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য

সে স্থানটি গাই-ধারা নামে সাধারণে অভিহিত হয়। এখানেও প্রতি বৎসর পর্ব্বোৎসব হয় এবং এই ধারাগুলি সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

হনুমান ধারার কাছে আসিয়া প্রসাদ দেখিল, সেখানে তার 'কিরা'র সম্মান রাখিয়া পার্ব্বতী উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার খুড়া খুড়ি, এবং খুড়তুত বোন মোহিনীও উপস্থিত। তারা সকলে বসিয়া চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে। শোনা গেল, ইহারা সকলেই জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করিবার জন্য পাগাড়ে আসিয়াছে।

প্রসাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে কুটুম্বরা সকলেই আনন্দিত হইল এবং বাউরী জাতিসুলভ কুটুম্ব বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া প্রসাদকে টানিয়া লইয়া খুড়শ্বশুর নিজের সঙ্গে 'এক থাবল' খাওয়াইতে বসাইলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে এবং ক্ষুৎপিপাসায় প্রসাদ অনেকটাই শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং বিশেষ আপত্তি বোধ করিল না। কিন্তু এতগুলি কুটুম্বের মাঝখানে পার্ব্বতীকে দেখিয়া, প্রসাদের মনটা খুবই দমিয়া গেল, পার্ব্বতীর উপর একটু রাগও হইল। ভাল বিপদ! এত গুলি আত্মীয়ের সঙ্গে যে পার্ব্বতী পাহাড়ে আসিয়াছে, সে কথা আগে বলে নাই কেন? এবং যদি বা হনুমান-ধারার এই খানেই উহারা আশ্রয় লইয়াছে, তবে পার্ব্বতী একটু আগাইয়া গিয়া, নিভৃত স্থানে প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না কেন? প্রসাদের যে দুটা গোপনীয় কথা বলিবার ছিল, সেটা কি পার্ব্বতী বোঝে নাই! প্রসাদের আদিম মানব সুলভ বর্ব্বরতা পুষ্ট হৃদয়টি থাকিয়া থাকিয়া, ক্ষোভের আতিশয্যে 'গুরগুরাইয়া' উঠিতে লাগিল।

কুটুম্বদের সঙ্গে সময়োচিত দু'একটা মিষ্ট আলাপ-আলোচনা চলিল কিন্তু পার্ব্বতী আর কোন কথায় ভিড়িল না। সে উদাস গম্ভীরভাবে

বিমুখ দৃষ্টিতে চুপ করিয়া রহিল। সূক্ষ্ম-মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, মূর্খ প্রসাদ বুঝিল না—নির্জ্জনতার সুযোগে সে ঝোঁকের মাথায় যে চাঞ্চল্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছে, তাতে পার্ব্বতীর ব্যথিত মনকে অধিকতর বেদনা-বিক্ষিপ্ত করিয়াই ফেলিয়াছে! সে মনের মধ্যে এখন প্রসাদের জন্ত বিন্দুমাত্র সহানুভূতির স্থান নাই!

আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইল। প্রসাদ হঠাৎ সকলকে শুনাইয়া খুড়শ্বশুরের উদ্দেশে বলিল, "খুড়া হে, অঘান মাসে ধান কাটার সময় আমি পাব্বতীকে দিন কতকের লেগে লিয়ে যাব। লইতুনি দুটা ছেল্যা লিয়ে ক্ষ্যাতের কাজ ত পারবেক নাই—ই যায়ে আমার সাথে ক্ষ্যাতে খাটবেক। আমার শাশুড়ীকে কথাটা বলি দিও।"

কথাটা বলিয়াই প্রসাদ আড়চোখে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, পার্ব্বতী প্রস্তাব শুনিয়া রুদ্র দৃষ্টি তুলিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে! সে দৃষ্টিটা ভাষায় অনুবাদ করিলে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমার কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালের ফরমাস খাটিবার জন্ত, তোমার প্রিয়তমা গৃহবাসিনীর লাথি ঝাঁটা খাইতে তোমার গৃহে যাইব বই কি? পার্ব্বতী সে পাত্রীই নয়!"

কিন্তু পার্ব্বতী মুখে কিছুই বলিল না। নিজের কাঠের বোঝাটার জন্ত ব্যস্ততা জানাইয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া পড়িল। কাঠগুলা নীচে ছিল।

পার্ব্বতী সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া প্রসাদেরও হঠাৎ স্মরণ হইল তার প্রভু অনেকক্ষণ পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছেন, তার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। অতএব সেও তাড়াতাড়ি নিজের ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া দ্রুতপদে পার্ব্বতীর পিছু ধরিল।

পাহাড়ের পথে

মোড়ের গাছ-পালার আড়ালে আসিয়া পার্ব্বতীর কাঁধের উপর একটা আদরের ধাক্কা হানিয়া প্রসাদ নিম্ন-কণ্ঠে বলিল, "তুর লেগে পাহাড় হতি ফুল আনেছিলাম, তু লিয়ে যা—"

কোঁচড় হইতে এক মুঠা পাহাড়ী-ফুল বাহির করিয়া সে পার্ব্বতীর হাতে গুঁজিয়া দিল। পার্ব্বতী বিনাবাক্যে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে প্রসাদের মুখের দিকে চাহিল, তারপর পিছু ফিরিয়া ফুলগুলি হনুমান মূর্ত্তির উপর ছুঁড়িয়া দিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে করিতে নিজ মনে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

প্রসাদ ক্রুদ্ধ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "সাত অনুপাড়ি বিদ্যা তোর! ফুলগুলা ফাব্ড়াই দিলি যে?"

পার্ব্বতী প্রস্থানোন্মুখ হইয়া শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "হনুমানজীর কাছে আশীর্ব্বাদ মাগুছি যেন তোর রীত'টো ভাল হয়, আর আমার ছেলেটো যেন তোর মত না হয়।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে তীরবেগে ছুটিয়া নামিতে সুরু করিল। বোঝার ভারে ক্লিষ্ট, প্রসাদের সাধ্য ছিল না যে তত দ্রুত ছুটিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গ ধরে—সুতরাং সে হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া শুধু বিমূঢ়-দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর প্রস্থান পথটার দিকে চাহিয়া রহিল।

গোলাপ সিংহ

১

সন্ধ্যা হয়—হয়।

সমস্ত দিনের দারুণ পরিশ্রমকর ব্যাধবৃত্তির পর আমরা উত্তেজনা-ক্লান্ত দেহে আমরা যখন তাঁবুতে ফিরিলাম, গোর্খা জমাদার গোলাপ সিংহের দুঃসাহসিক ব্যাঘ্র-শিকার কাহিনী লইয়া চারিদিকে রীতিমত কোলাহলোৎসব চলিতেছে।

আমাদের অভিযানের লক্ষ্যস্থল গারো পাহাড়ের একটা প্রান্তসীমা। এখানকার বিখ্যাত রাজষ্টেটের মহারাজা বাহাদুর, তাঁর বন্ধুস্থানীয় জন চার ইংরেজ রাজপুরুষ এবং মহারাজের অনুচরবর্গের সহিত প্রতি বৎসরের মত এবারেও শিকারের উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আসা হইয়াছে। স্থানটা শহর হইতে দূরে, রীতিমত জঙ্গলী দেশ।

প্রায় আট বৎসর রাজষ্টেটে চাকরী লইয়াছি। প্রতি বৎসরই এই শিকারীদলের সহিত আমাকে আসিতে হয়। প্রতিবারই বিস্তর বাঘ, ভালুক, বুনো-মহিষ, বন্য-বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এবারের মত এমন বিষম বিপদে কখনও পড়ি নাই, এবং গোর্খা গোলাপ সিংহের মত এমন অসম সাহসিক শিকারীর শিকার-কৌশলও কখনও দেখি নাই। পাকা শিকারী গর্ডন সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, মহারাজা বাহাদুরের মন্ত্রসিদ্ধ বন্দুকের কৃতিত্ব, এবং এই অধম বাঙালীর বড় সাধের সুতের-শো টাকা দামের দোনলা বন্দুকের সব গৌরব ব্যর্থ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত ব্যাঘ্ররাজ যখন প্রচণ্ড বিক্রমে মহারাজের হাতীর উপর চড়াও হইয়াছিল, তখন জমাদার গোলাপ সিংহ একখানি

মাত্র কুকরীর উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে যে সেই হিংস্র বন্য রাক্ষসের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, কি কৌশলে ও কি ক্ষিপ্রতার সহিত তিন তিনবার তার আক্রমণ এড়াইয়া পেটের তলা দিয়া গুড়ি মারিয়া পার হইয়া আসিল—সেই দারুণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কি ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া, ধীর বুদ্ধি বিবেচনার সহিত তার মুখে ও পাঁজরে ছুরিকাঘাত করিয়া কোন শক্তিতে তাকে জন্মের মত ঠাণ্ডা করিয়া দিল, সে দৃশ্য যেন অদ্ভুত, তেমনি অস্বাভাবিক। ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, সেটা যেন বায়স্কোপের অদ্ভুত দৃশ্য। নচেৎ যে বাঘ তিন তিন বন্দুকের গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ মরিয়া হাতীর মাথায় থাবা বসাইতে ও হাওদায় কামড় দিতে পারে, সে যে কোন আক্কেলে, ওই জমাদারের খুদে কুকরির মুখে শির সমর্পণ করিল—ভাবিয়া পাইতেছি না।

গোলাপ সিংহ লোকটা পদমর্য্যাদাতেও নিতান্ত ছোট। অল্পদিন মাত্র সে এ দেশে আসিয়াছে, এবং রাজসরকারের অধীনে হাতীশালার জমাদারী পাইয়াছে। সে নেপালী গোর্খা—উপাধি ঠাকুর রাজপুত, অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন লোক। তার শুভ্র প্রশান্ত ললাট, যোড়া ভ্রূ, তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকা সুগঠিত বলিষ্ঠ আকৃতি, অভিজাত বংশের সাক্ষ্য দিত এবং নিরক্ষর মূর্খ হইলেও তার চলিবার, বসিবার, দাঁড়াইবার, সেলাম লইবার ও দিবার ভঙ্গিগুলার মধ্যে এমন একটা গুরুগম্ভীর রাজকীয় ছন্দের আদব কায়দা প্রকাশ পাইত, যাতে তাকে নিতান্তই একজন হাতীশালার জমাদার বলিয়া চিনিয়া না রাখিলে হঠাৎ একজন বড়দরের সেনাপতি বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। লোকটা বয়সে প্রৌঢ়।

শিকারী হাতীগুলার তদারকের জন্য সে আমাদের দলের সঙ্গে

আসিয়াছিল, শিকারের জন্য আসে নাই। কিন্তু আজ সকালেও সকলের কাছে যার নাম অখ্যাত ছিল, হঠাৎ সন্ধ্যায় তা সুবিখ্যাত হইয়া গেল। অদৃষ্ট আর কাকে বলে! ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে লোকটা অকস্মাৎ 'মোরিয়া' হইয়া যে ধরণের ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের খেলা দেখাইয়াছে, হাওদায় আরূঢ় মহারাজা ও সাহেববৃন্দের জীবন রক্ষার জন্য, লম্ফশীল বাঘের লেজ ধরিয়া যে ভাবে তার পিঠে চড়িয়া পাঁজরে কুকরি হানিয়াছে তাতে সকলেই স্তম্ভিত! বিদেশী রাজপুরুষগণের পর্য্যন্ত প্রশংসা মুগ্ধ দৃষ্টির লক্ষ্য স্থল আজ—সে!

বাঘ মরিলে, বিপদ কাটিয়া গেলে সাহেবেরা যখন উল্লাস ভরে আনন্দধ্বনি করিয়া করমর্দ্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়াইলেন, তখন বাঘের থাবায় তার পায়জামা ছিঁড়িয়া উরুদেশ হইতে প্রবল বেগে রক্ত ছুটিতেছিল, কিন্তু সে দিকে সে ভ্রুক্ষেপ করিল না। তৎক্ষণাৎ শিক্ষিত সৈনিকের মত রীতিমত মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করিয়া, এমন প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিল, যেন এরূপ সম্মানলাভে সে চির অভ্যস্ত এবং দৈহিক যন্ত্রণা বলিতে কোন বালাই তার নাই! স্নায়ুর উপর এই অসামান্য আধিপত্য দেখিয়া আমরা ত চমকিলাম, সাহেবেরাও বিস্মিত হইলেন! লোকটা সত্যই অদ্ভুত!

২

রাত্রে আহারের টেবিলে আমরা বাঙালী হোমরা চোমরার দল সমবেত হইয়া আজিকার কাণ্ড—তথা গোলাপ সিংহের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন, "সেই অবস্থায় এক মাত্র কুকরি নিয়ে

আমি যদি বাঘের মুখে পড়তুম, তা হলে 'চানাচুর বাদাম ভাজা' ছাড়া আর কিছু হতে পারতুম কি না সন্দেহ!"

নিজের ক্ষীণ দেহের দিকে চাহিয়া সহাস্তে বলিলাম, "আর আমি হলে ত নিঃসন্দেহে!"

আমাদের দলের মধ্যে সৌরেশবাবু ছিলেন সেই শ্রেণীর ভদ্রলোক, কবির ভাষায় যাকে বলে "পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণু!" তিনি নিজে একজন ভাল শিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, কিন্তু চিড়িয়া শিকার ছাড়া আর কোন শিকারেই তাঁর হাত খেলিতে দেখি নাই! নিতান্ত অপ্রসন্ন ভাবেই তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এবার আর পারিলেন না। অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, "নাও বাপু, লোকটাকে নিয়ে তোমরা বেজায় বাড়াবাড়ি করে তুলেছ! বখশীসের লোভে ব্যাটা একটা বাঘ মেরেছে, তার হয়েছে কি?"

ডাক্তারবাবু স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী; তিনি এতক্ষণ কথা কহেন নাই, এবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "বখশীসের লোভে যদি ওম্নি ভাবে প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঘ মারা সহজ হয় সৌরেশবাবু—তা হলে আপনি মারেন নি কেন? মহারাজা আপনারও অন্নদাতা, গোলাপ সিংহেরও অন্নদাতা—অন্নদাতার জীবন রক্ষার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করা সকলেরই উচিত ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে সে ধর্ম্মবুদ্ধিটুকুর মর্য্যাদা কে কতটা রেখেছিল হিসাব করুন ত!"

ডাক্তারের এই শ্লেষটুকু আমাদের সকলেরই চিত্তকে নাড়া দিল, কিন্তু সৌরেশবাবু অটল! তিনি সদম্ভে বলিলেন, "হ্যাঃ! জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিল, না হাতী করেছিল! কই মরে নি ত!"

ডাক্তার ধীরে বলিলেন, "কিন্তু মরতে পারে! উরুর প্রান্তে যে ভাবে বাঘের নখ বসেছে, তাতে ভিতরে ভিতরে সেপ্টিক ধরে শীঘ্রই মারা

যাবার ভয় রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তেজস্বী—শুধু দেহে নয়, মনেও! বাইরের দিকে সে বেশ সতেজ রয়েছে বটে, কিন্তু তার ভিতরের অবস্থা আমি বুঝেছি। যদিও তার কাছে মিথ্যে কথা বলে সাহস দিলাম, কিন্তু সে নিজেও টের পেয়েছে। হেসে বললে, "ডাক্তার যতই বল, আমি বুঝতে পারছি, এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ আছি, চেষ্টা কর, কিন্তু এতেই আমাকে যেতে হবে!"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন, "পাগাড়ী প্রাণ বাবা! ওতে মরণ বাঁচন সবই সমান সয়!"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ সমানই সয়!"···সে বল্লে, "আমি দেখলাম, এ সঙ্কটে একটা প্রাণ উৎসর্গ না করলে মহারাজকে নিরাপদ করা যায় না! মহারাজের জীবন বহু মূল্যবান—কিন্তু আমার জীবন অতি অল্পদামের। মরব জেনেই আমি বাঘের ওপর পড়েছিলাম। নিমক খেয়েছি, তার মান রাখব না?"

মন বলিয়া উঠিল—বাঃ! কিন্তু সোরেশবাবুর ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে হইল!

জুনিয়ার ম্যানেজার বলিলেন, "কর্ত্তা এত ঘায়েল হয়েছে, তবু গোঁয়ার্তমি ঠিক আছে! ডাক্তার ওষুদে ফোঁটা কতক ব্রাণ্ডি মেশাবে শুনেই একেবারে রুখে উঠেছে! বলে "খবরদার ডাক্তার, তা হলে তোমার ওষুধ ছোঁব না। মরতে ত বসেইছি এ অবস্থায় মদ খাইয়ে আমার দেহ আর অপবিত্র কোর না, আমি বাবা পশুপতিনাথের সেবক, আমাকে শেষ সময়ে সদাচারে যেতে দাও!" —ব্যাটা গোঁড়ার হদ্দ!"

আমাদের টেবিলে তখন ইংরেজী কেতায় পাকস্থলীর কল্যাণের বোতল গ্লাস উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই বিরুদ্ধবাদী অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকটার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া এমন বেপরোয়া

সমালোচনা আমরা জুড়িলাম, যা জনসমাজে প্রকাশ করিবার মত নয়! কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই বোধ হয়—বিবেকের কশাঘাত অল্প বিস্তর পরিমাণে পরিপাক করিলাম। কারণ সে রসিকতার দম বেশীক্ষণ রহিল না এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকলে কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম।

হায় রে!…গায়ের জোরে তাল ঠুকিয়া বিশ্বের সব-কিছু ভালকে ভ্যাংচাইলে যদি বিশ্ব জয় করা যাইত, তবে বিশ্বেশ্বরকে বোধ হয় আমরা এতদিন আন্দামানে নির্ব্বাসন দিতাম!

ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন। বলিলেন, "লোকটার গায়ের কাপড় খোলবার পর দেখলুম সর্ব্বাঙ্গে অনেকগুলা বন্দুকের গুলির দাগ রয়েছে। লোকটা আগে কি করত জানেন?"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু বলিলেন, "ও নিজে বলে 'পল্টনের বড় সাহেব-সুবোদের কাছে আর্দ্দালী ছিলাম।' কিন্তু গুজব শুনেছি, একসময়ে সরকারী পল্টনের বেশ একটা নামজাদা সিপাই ছিল। কোনও গুরুতর অন্যায় করায় চাকরী যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "অন্যায়টা কি?"

তিনি বলিলেন, "তা জানি না। লোকটা এদিকে মূর্খ হলেও আদব কায়দা বেশ সুন্দর জানে; ইংরেজিও বোঝে একটু, বলতেও পারে। উচ্চারণ ঠিক সাহেবী ধরণের, আমাদের মত কেতাবী গৎ নয়!"

৩

পরদিন সকালে উপর হইতে পরোয়ানা আসিল—আমার, আহত হস্তী, মাহুত এবং গোলাপ সিংকে রাজধানী অর্থাৎ সহরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে সরকারী চিকিৎসাগারে তাদের জন্য যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আজই বাহির হইতে হইবে।

পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দুই তিন দিনের পথ অতিক্রম করিতে হইবে, সুতরাং তদনুযায়ী যাত্রার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। রসদ সংগৃহীত হইল, আহতদের শুশ্রূষার জন্য ড্রেসার কম্পাউণ্ডার ঔষধ পত্র, ডুলি খাটুলি যোগাড় হইল, জিনিষপত্র বহিবার কুলি আসিল—সব স্থির করিয়া ডেরাডাণ্ডা তুলিতেছিল, এমন সময় আবার পরোয়ানা উপস্থিত! অবসর সময়ে ব্যাধ বাহাদুরগণের চিত্তবিনোদনের জন্য যে বাইজী ঠাকুরাণীগণ নাচগান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন পীড়িতা, সুতরাং তাঁকেও সহরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য তাঁর সারেঙ্গী প্রভৃতি সঙ্গীরাও সঙ্গে যাইবে।

আদেশ পাইয়া চক্ষুঃস্থির! রাগ করিয়া ডাক্তারকে বলিলাম, "আপনি মেডিকেল সার্টিফিকেট ঝাড়বার আর সময় পেলেন না? ঠিক আমাদের বেরুবার মুখেই তোপ দাগে! কেন, আমরা বিদেয় হবার পর অসুখটা মঞ্জুর করলে হোত না?"

ডাক্তার স্মিতমুখে বলিলেন, "সামান্য রক্তামাশায়, ও-তো পথে যেতে যেতেই ভাল হয়ে যাবে। তারপর ঠুংরি খাম্বাজ শুনতে পাবে, মন্দ কি?"

ঠুংরি খাম্বাজের নিকুচি করিয়াছে! এ দুর্গম পথে এ ঝামেলা অত্যন্তই দুঃসহ! তা ছাড়া আমি বিংশ শতাব্দীর অঙ্কে আবির্ভূত হইলেও এবং চাকরীর খাতিরে, এই অমার্জিত প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রিয় প্রভু গোষ্ঠির সঙ্গে কারবার করিতে বাধ্য হইলেও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সংশ্রব পছন্দের চোখে দেখিতাম না। আমার এই শুচিবায়ুগ্রস্ততার জন্য, ঠাট্টা বিদ্রূপের অত্যাচার যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিতে হইত কিন্তু উপায় নাই! আমার রুচি স্বতন্ত্র!

কিন্তু রুচি অরুচির কান্না যেখানে চলে চলুক, চাকরীর কাছে চলে না। চাকর, চাকরই! অগত্যা উপরের হুকুম তামিল করিতে হইল।

দুর্গা বলিয়া বাহির হইলাম। সর্দ্দারীর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া সমস্ত পথ আহত হাতী, মাহুত, গোলাপ সিংহ এবং পীড়িতা বাইজীর সংবাদ লইতে সমানভাবে চোখ কাণ খাড়া রাখিতে হইল। আমার সৌভাগ্যবশে পথের মধ্যে পীড়িতদের কাহারও কোন নূতন উপসর্গ দেখা গেল না। দিনটা নিরাপদে কাটিল।

শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইল। সন্ধ্যার পর একটা গ্রামের প্রান্তে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রের জন্য সকলের যথোপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া, পীড়িতদের আর এক দফা দেখিয়া শুনিয়া নিজের তাঁবুতে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি—সর্দ্দারের সর্দ্দারীর উপর আর একজনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ উদ্যত হইয়া সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিয়াছে—সে গোলাপ সিংহ! নিজের ডুলির মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া সে নীরবে সর্ব্বক্ষণ তার রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছে, ক্ষত যন্ত্রণার জন্য কোন সাড়া শব্দ তার নাই, যখনই কুশল জিজ্ঞাসা করা যাক, মাথা নাড়িয়া নীরবে জানাইতেছে—ভাল, এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে চোখ বুজিয়াই থাক, আর খুলিয়াই থাক, তার লক্ষ্য যে আমার—শুধু আমারই বা বলি কেন, দলের ছোকরা ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের বাচালতার উপর পর্য্যন্ত ঠিক স্থির আছে, তা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। বাইজীর কুশল জিজ্ঞাসার জন্য পথে আসিতে আসিতে যখনই কেহ তার ডুলির পাশে ঘোড়া থামাইয়াছে, তখনই সে নিজের ডুলি হইতে ঘাড় উঁচাইয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রশ্ন-কারককে লক্ষ্য করিয়াছে। আমি নিজেও সে দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাই নাই, তাতে যুগপৎ লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়াছি, মনে মনে বলিয়াছি, 'ওহে বাপু, আমাকে এতটা অপদার্থ ঠাওরাইও না। যদি ততটা 'বখা' হইতাম, তবে এতদিন

মরিয়া ভূত হইয়া হাওয়ায় মিশিয়া যাইতাম। তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সশরীরে এখানে বর্ত্তমান থাকিতাম না।'

কিন্তু যে লোকটা নিতান্তই অধীনের অধীনস্থ, তাকে মুখ ফুটিয়া এতগুলা কথা বলা চলে না। কাজেই বিরক্ত চিত্তে মৌন গম্ভীর থাকিতে হইয়াছে।

তাঁবুতে হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি, একজন ছোকরা কম্পাউণ্ডার আসিয়া বলিল, "বাইজী সেলাম দিয়েছে, একবার আপনার দর্শন চায়।"

বলিলাম, "কি দরকার তুমি জেনে এস বাপু।"

ছোকরা চলিয়া গেল এবং গেল যে, তা সেই পথ!...আধঘণ্টা পার হইল, অথচ তার দেখা নাই। তিনটা সিগারেট ভস্ম করিলাম, তবু বাইজীর দরকারের সন্ধান পাইলাম না। এখন কি করা যায়?

মন বলিল কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যই!

অগত্যা নিজেই সন্ধান লইতে উঠিলাম। আমার তাঁবুর পাশেই গোলাপ সিংহের তাঁবু। তাঁবুর দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলাম, সামনেই খড়ের বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিয়া মালা জপিতেছিল। আমায় দেখিয়া অভিবাদন করিল। বলিলাম, "এখন কেমন আছ জমাদার?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি একটা রাত্রিচর ছোট পাখী সাঁ করিয়া আমার মাথার পাশ দিয়া উড়িয়া তাঁবুতে ঢুকিল, পরমুহূর্ত্তে ঝটপট করিয়া উড়িয়া আবার বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় আমার হ্যাটের উপর একটা ঝাপ্টা হানিয়া পলাইল! আমি 'আঃ' বলিয়া মাথা নোয়াইলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গোলাপ সিংহ বলিল, "ওটা কি? চামচিকা?"

বলিলাম, "কি জানি, তা হতে পারে।"

অন্যমনস্ক ভাবে সে বলিল, "চামচিকার স্পর্শ ভাল নয়।"

বিদ্রূপভরে বলিলাম, "কি হয়? মরে যায়?"

সে একটু হাসিল, উত্তর দিল না। বিদ্রূপের রোখ চড়িয়া গেল, বলিলাম, "হাঁচি, টিকটিকি, চামচিকে, গিরগিটি তুমিও তা হলে মান?"

সে ধীরভাবে বলিল, "পরিণামদর্শী মাত্রেই মানে। যাক, এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

উত্তরে জানাইলাম, তাহাদেরই খোঁজ তল্লাসে বাহির হইয়াছি। তার যন্ত্রণা কিরূপ, রাত্রের আহার হইয়াছে কি না, ক্ষুধা কিরূপ, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে উত্তর দিল।

কথা চলিতেছে, দূরে চটপট চটিজুতার আওয়াজের সঙ্গে গুণ গুণ গানের সুর শোনা গেল!

"আমার মাথা ন্যাড়া করে দাও হে তোমার
ধারালো ক্রপের ক্ষুরে
কাল কোঁকড়ানো চুল হে আমার
চেঁচে ফেলে দাও দূরে।"

চাপা আওয়াজ হইলেও তাতে উৎসাহ-মত্ততার অভাব ছিল না। স্বরে চিনিলাম—সেই ছোকরা কম্পাউণ্ডার! মনে মনে বলিলাম, "আমিই তোমার মাথা ন্যাড়া করিব, আগাইয়া এস বাপু!"

গোলাপ সিংহ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "হুজুর, স্পর্শদোষ বিচারটা অনেকে অলীক কুসংস্কার বলে মনে করেন, নয়? স্থূল স্পর্শ দূরে থাক, একটা নটীর বাতাসের প্রভাব স্পর্শে এই ছোকরার দল কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করেছেন কি? এদের এই মত্ততার পরিণাম—এদের দেহ মন আত্মার সমস্ত কল্যাণ, কোন

নিরুদ্দেশের ঠিকানায় যে পাঠাবে, তা এরা জানে না। আপনি এদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, আপনি এদের সংযত করুন, আমার অনুরোধ!"

তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা ধ্বনিত হইল যে, অবাক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

ছোকরা ততক্ষণে তাঁবুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, দুয়ারের সামনেই আমাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া—"এই যে! আপনি এখানে?" বলিয়া দাঁড়াইল!

গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "হুঁ, তুমি ত আচ্ছা ডুব মেরেছিলে! তাঁর খবর কি?"

ছোকরা সঙ্কুচিত ভাবে একবার গোলাপ সিংহের দিকে চাহিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "অনুগ্রহ করে একবার এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

বাহিরে গিয়া তাঁবুর আড়ালে দাঁড়াইলাম, সে চুপি চুপি বলিল, "বাইজী বললেন, আপনি গিয়ে যদি বসেন, তাহলে একটু সঙ্গত বসায়। দু চারটে বৈঠকী গানটান—"

আমি সঙ্গীত ভক্ত এবং বয়সে প্রবীণ নহি, ইহা সত্য। কিন্তু তা হইলেও স্থান কাল পাত্রের বিচার ভুলিয়া আমোদে মত্ত হওয়া পছন্দ করি না। উপরওলাদের খাতিরে হাজিরা সহি করিবার জন্য—না হয় বাইজীর গানের আসরে আবির্ভূত হই, তা বলিয়া এই অসুস্থগুলির দায়িত্ব স্কন্ধে থাকিতে এখানে এমন অসময়ে নিজের খুসীর খাতিরে 'ভেড়ার গোয়ালে' আগুন লাগাইব? তার উপর গোলাপ সিংহের অনুরোধ মনে পড়িল। গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "মা লক্ষ্মী আছেন কেমন?"

আমার বিশেষণের বহর দেখিয়া সে থতমত খাইল। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

কথাটার পুনরুক্তি করিয়া বলিলাম, "বাইজী ভাল আছেন ত? তাঁকে বিশ্রাম করতে বলো, এ সময় গান বাজনা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। আর তুমি ওষুধ পত্র নিয়ে ড্রেসারদের সঙ্গে করে একবার এস, হাতীটার ঘা রাত্রেই ড্রেস করে রাখা যাক। নইলে সকালে বেরুতে দেরী হবে।"

ছোকরার মুখের উৎসাহ প্রদীপ্ত আনন্দের আলো এক মুহূর্তে নিভিয়া গেল! কোথায় বাইজীর বৈঠকী গান, আর কোথায় আহত হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা!—আশা করি ছোকরা মনে মনে আমার সদ্য স্বর্গলাভ কামনা করিল। মুখ আঁধার করিয়া সে চলিয়া গেল। আমিও হাতীর উদ্দেশে চলিলাম।

৪

হাতীর ক্ষত পরিচর্য্যা সমাধা হইল। দলবল লইয়া ফিরিতেছিলাম, তাঁবুর কাছে আসিয়া পৌছিয়াছি, হঠাৎ অসাবধানে বিষম হোঁচট খাইয়া, আছড়াইয়া পড়িলাম। হাতে একটা ঔষধের বোতল ছিল, সেটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া হাঁটুর চারিপাশে বিঁধিয়া গেল, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিল!

সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে তাঁবুর মধ্যে আনিল, ক্ষতস্থান ধুইয়া মুছিয়া ঔষধ পত্র দিয়া যথারীতি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। সারারাত বিনিদ্র নয়নে যন্ত্রণার আরাম উপভোগ করিলাম, রাত্রিচর পাখীর স্পর্শ ও গোলাপ সিংহের বাণী মনে পড়িল। লোকটার উপর শ্রদ্ধা বাড়িল।

সকালে উঠিয়া আবার যাত্রা সুরু হইল। এবার ঘোড়া ছাড়িয়া ঘোঁড়া পায়ে ডুলিতে আশ্রয় লইলাম। পথের মধ্যে গোলাপ সিংহের জ্বর

বাড়িয়া উঠিল, তার দিকে সতর্ক মনোযোগ রাখিতে হইল। আমার সেবা যত্নে সে কুণ্ঠিত হইল, কৃতজ্ঞ হইল, বাবা পশুপতিনাথের নিকট বার বার আমার জন্য কল্যাণ কামনা করিল।

সন্ধ্যায় আবার তাঁবু পড়িল। আহত হাতী ও মাহুত ভাল আছে, আমার পায়ের যন্ত্রণাও তখন কমিয়াছে। কিন্তু গোলাপ সিংহ বে-এক্তার হইয়াছে! বুঝিলাম তাকে 'কালে' ধরিয়াছে, মনটা খারাপ হইয়া গেল। আসন্ন-মৃতের জন্য প্রাণটা সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।

যথাসাধ্য সব কর্তব্য পালন করিয়া শয্যা লইলাম। দিনে ডুলিতে আসিতে আসিতে বেশ খানিক ঘুমাইয়াছিলাম, তাতেই গত রাত্রের অনিদ্রার গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল। সহজে ঘুম আসিল না। শয্যায় পড়িয়া নানা কথা ভাবিতেছিলাম, পাশের তাঁবু হইতে গোলাপ সিংহের মৃদু কাতরানি কানে গেল। ঘুম যখন হইতেছে না, তখন লোকটাকে একবার দেখিয়া আসা যাক।

উঠিলাম। রক্ষী সৈন্যরা জাগিয়াছিল, তাহাদের এক জনের সাহায্যে খোঁড়া পা লইয়া তার তাঁবুতে ঢুকিলাম।

সে চাহিয়া দেখিল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি এসেছেন। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

বসিলাম। বলিলাম, "বল।"

সে বলিল, "কাল আমরা শহরে পৌঁছাব। পৌঁছেই আমার ছেলেকে আসবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন।"

পকেট হইতে পেন্সিল ও নোটবুক বাহির করিয়া তার ছেলে শম্ভু সিংহের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম, শহরে পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে টেলিগ্রাম পাঠাইব।

সে যখন অনেকটা সুস্থ হইল তখন আপনা হইতে পরিচয় দিল যে তার

ছেলে 'আংরেজি' শিক্ষিত। নেপাল সরকারের অধীনে 'কাঠমুণ্ডু'তে কি একটা চাকরী করে। তার বিবাহ হইয়াছে, সম্প্রতি একটি সন্তান হইয়াছে। সেই গোলাপ সিংহের একমাত্র পুত্র। ছেলেটি বড় ভাল!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীতে আর কে আছে? তোমার মাতা, স্ত্রী—"

সে মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে জানাইল—"সবাই আছে।" কিন্তু আর কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। তার যন্ত্রণা আবার বাড়িল, সে অধীর হইয়া পড়িল।

যদি ঘা ধোয়াইয়া দিলে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়, সেই ভরসায় ড্রেসার কম্পাউণ্ডারদের ডাকিয়া পাঠাইলাম।

বসিয়া বসিয়া তার যন্ত্রণাভোগ দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে চোখ মেলিয়া চাহিল, সনিশ্বাসে বলিল, "বাবুসাহেব, ঢের কষ্ট করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না। অকালে আয়ুক্ষয় করবার মত, দারুণ পাপানুষ্ঠান করে রেখেছি, তার ফল আমায় ভোগ করে যেতেই হবে। দেখুন কি শাস্তি!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করার চাইতে—এইখানেই সজ্ঞানে একেবারে শাস্তিভোগ শেষ করে যাওয়াই ভাল। যা হচ্ছে বেশ ভালই হচ্ছে। হাঁ, আর একটা কথা শম্ভু এসে পৌছান পর্য্যন্ত যদি জীবিত না থাকি তবে তাকে বলবার জন্য গোটাকতক কথা আপনার জিম্মায় গচ্ছিত রেখে যাই, তাকে বলতে পারবেন?"

বুক কাঁপিয়া উঠিল কে জানে কি কথা! আত্মদমন করিয়া বলিলাম, "পারব, বল।"

সে বলিল, "প্রথম কথা—আমার মৃত্যু সংবাদ আমার মাকে জানিয়ে যেন বলে, সতীবাক্য আমার জীবনে সফল হয়েছে, বাঘের খাবাই আমার

মৃত্যুর কারণ হোল, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা—শম্ভু তার বিমাতাকে যেমন সম্মান করে মাথায় তুলে নিয়েছে, চিরদিন যেন তেম্নি সম্মান করে মাথায় রাখে। তিনি নির্দ্দোষ!"

বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, "তোমার দুই বিবাহ?"

মাথা নাড়িয়া সে চোখ বুজিল। দু' ফোঁটা অশ্রু তার চক্ষু প্রান্ত বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। ভাবগতিক দেখিয়া আর প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না, নির্ব্বাক রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ-পীড়িত কণ্ঠে বলিল, "বাবুসাহেব, শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কখনো পরস্ত্রীর দিকে কুৎসিত কামনার দৃষ্টিতে চাইবেন না। তাতে যে শুধু মানসিক অধোগতি মাত্র লাভ হবে, তা নয়। জীবন অভিশপ্ত হয়ে যাবে! পরস্ত্রীকে পাপ ভাবে স্পর্শ মাত্রই অয়ুঃক্ষয়—সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অধোগতিও অনিবার্য্য, এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়! সচেতন অনুভবশক্তিশীল, বিবেকনিষ্ঠ মানুষের জীবনে এটা পরীক্ষিত সত্য!"

আর কথা হইল না। ড্রেসাররা আসিয়া ক্ষত পরিষ্কার করিতে বসিল। সে কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাবহ দৃশ্য!

কায শেষ হইল, ড্রেসাররা তাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। যন্ত্রণার প্রথম বেগটা সামলাইয়া, সে একটু সুস্থ হইল, আমিও বিদায় নিয়া উঠিলাম।

গোলাপ সিংহ শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। এদিকে নিরক্ষর হইলেও সৌজন্য শিষ্টাচার তার যথেষ্ট ছিল।

করমর্দ্দন করিয়া সহানুভূতি-সিক্ত করুণ কণ্ঠে বলিলাম, "এখনো কি যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"খুব।" নমস্কার করিয়া সে রুদ্রাক্ষের মালাটি জপ করিবার জন্য তুলিয়া লইল। শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ম্লান হাসি টানিয়া বলিল, "পরিণামদর্শী হতে শিখুন বাবুসাহেব! এ জগতে প্রত্যেক কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী!···হবে না যন্ত্রণাভোগ! শয়তানের প্রলোভনে, ইন্দ্রিয় সুখের জন্য দেহে উৎকট পাপানুষ্ঠান করেছি। দেখুন, সেই দেহের উৎকট শাস্তি যন্ত্রণাভোগ!"

উঠিয়াছিলাম, তার কথা শুনিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম। আরও কথা শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে মালাশুদ্ধ হাত যুক্ত করিয়া সবিনয়ে বলিল, "ক্ষমা করুন, এবার আমায় একা থাকতে দিন। বলবার কথা হয়ত অনেক ছিল—কিন্তু বলার সময় আর নাই। জীবনশক্তি শেষ হয়ে আসছে; যতক্ষণ জ্ঞান আছে, পৃথিবীর সব চিন্তা ভুলে ভগবানের নামে আমাকে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে দিন।"

হৃদয় ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। ভগবানের চরণোদ্দেশে তার মঙ্গল কামনা জানাইয়া নীরবে উঠিয়া আসিলাম।

৫

শহরে পৌছিলাম। রাজকীয় হাসপাতালে তাদের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, শম্ভু সিংহের নামে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বাসায় ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসিল, খোঁড়া পা বিষাইয়া উঠিল। তিন চার দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারিলাম না।

গোলাপ সিংহের খবর পাইতেছিলাম—অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছে। সেদিন রাত্রে হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে দেখিতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন শম্ভু সিংহের টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে,

সে আজ রাত্রে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু গোলাপ সিংহের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ, রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ!

মাথা ঘুরিয়া গেল। হায় অদৃষ্ট! এমন পাকচক্রে জড়াইয়া কাবু হইয়া পড়িলাম যে শেষ সময়ে নির্ব্বান্ধব অভাগাকে একটু দেখাশুনা করিতেও পারিলাম না। অশান্তিভরে কোন রকমে রাত্রিটা কাটাইয়া সকালেই হাসপাতালে ছুটিলাম, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! রুদ্রাক্ষের মালাধৃত ডান হাতটি বুকের উপর রাখিয়া গোলাপ সিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, তার পায়ের কাছে বসিয়া এক সুন্দর প্রিয়দর্শন নেপালী যুবক চোখের জল মুছিতেছে।

শুনিলাম সেই শম্ভু সিংহ। পিতার মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন পিতার বাক্‌রোধ অবস্থা; ভিতরে জ্ঞান ছিল, পুত্রকে চিনিতে পারিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভগবানের নাম শুনাইতে ইঙ্গিত করে। তার পর পুত্রের মুখে নাম শুনিতে শুনিতে জপমালাধৃত হাতটি বুকের উপর তুলিয়া শান্তভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বুঝিলাম,আমার কর্ত্তব্য গোলাপ সিংহ আমার জন্যই রাখিয়া গিয়াছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি শেষ করা হইল। শোকার্ত্ত শম্ভু সিংহকে লইয়া নিজের বাসায় আসিলাম।

সে একটু শান্ত হইলে নিভৃতে তাহাকে ডাকিয়া তাহার পিতার মন্তব্য জানাইলাম। শম্ভু নীরবে শুনিল, নীরব রহিল। শুধু তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সসঙ্কোচে বলিলাম, "আমার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধ ক্ষমা কর ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার বিমাতা কি—" প্রশ্নটা শেষ করিতে মুখে আটকাইয়া গেল।

শম্ভু আমার মুখের দিকে চাহিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তিনি

আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নন। তবু তিনি আমার মা, তাঁর জীবনের ইতিহাস বড় বিষাদবহ। তিনি আমাদেরই স্বজাতীয়া, সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর কন্যা। বিবাহও তাঁর সদ্বংশে শিক্ষিত রূপবান যুবকের সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হওয়া দূরে থাক—বড় অত্যাচার যন্ত্রণাপীড়িত হয়েছিল। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি সব সত্ত্বেও তাঁর স্বামীর মন ছিল বড় কদর্য্য, প্রকৃতি ছিল হিংস্র নিষ্ঠুর নির্ম্মম। সৌন্দর্য্যেও তিনি—সন্তান আমি, মাতৃরূপের কি আর পরিচয় দেব? রূপে মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সেই সৌন্দর্য্যই তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কদর্য্য সন্দিগ্ধ-চেতা স্বামী, সেই সৌন্দর্য্যের জন্যেই সর্ব্বদা তাঁর নিষ্পাপ তেজস্বী চরিত্রকে সন্দেহ করিতেন এবং অলীক সন্দেহে উত্তেজিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে সর্ব্বদাই তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতন করতেন।

তাঁর স্বামী ও শ্বশুর মীরাটে সরকারী গোর্খা পল্টনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তারা তখন সপরিবারে সেখানে বাস করতেন। পিতাও সরকারী পল্টনের পনের ষোল বৎসরের পুরাতন বিশ্বাসী কর্ম্মঠ সিপাহী। বুয়র যুদ্ধে চীনা যুদ্ধে কাজ দেখিয়ে তিনি সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভাগ্য দোষে তিনিও সেই সময়ে মীরাটে বদলি হন। প্রতিবেশী কন্যার প্রতি অত্যাচারের কথা কাণে উঠ্‌তেই তাঁর তেজস্বী বীর চিত্তে অশান্তি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে কাপুরুষোচিত অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, ফলে হিতে বিপরীত ঘটে। তাঁর এই অযাচিত পরহিতৈষিণা বৃত্তি সন্দিগ্ধচেতা কাপুরুষকে অধিকতর হিংস্র বর্ব্বরতায় মাতিয়ে তোলে, মেয়েটির ওপর নির্য্যাতন অত্যন্তই বেড়ে ওঠে!

অত্যাচারে অতিষ্ঠ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা বালিকা পালিয়ে এসে পিতার কাছে আশ্রয়প্রার্থিনী হন, নেপালে তাঁর পিত্রালয়ে তাঁকে পৌছে দিতে

অনুরোধ করেন। পিতা সেই সময়ে আইনের সাহায্যে যদি তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন তবে বোধ হয় সব দিকেই ভাল হোত, কিন্তু সে বুদ্ধি তাঁর হয় নি। নিজের দায়িত্বেই তাঁকে রক্ষা করতে উদ্যত হলেন, পল্টনের চাকরীর নিয়ম লঙ্ঘন করে বিনা ছুটিতে তদ্দণ্ডেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিত্রালয়ে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।

এ রকম অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যা করে থাকে তিনিও তাই করেন। পথে সর্ব্বত্রই তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেন। নেপালের নির্জ্জন দুর্গম পথে চলবার সময় বালিকার রক্ষার জন্য অনেকসময় পরস্ত্রী সম্বন্ধীয় সাধারণ দূরত্বের ব্যবধানও তাঁকে লঙ্ঘন করতে হয়। বাক্য ব্যবহারের এই সব অনাচার, সম্ভবতঃ তাঁর নৈতিক বুদ্ধি ও সংযম পূত উন্নত মনকে মোহাবিষ্ট কলুষিত করে। তারপর—সন্তান আমি, কি আর বলব? সংযমী চরিত্রবান পিতার ভ্রান্তি ঘটে, সয়তান তাঁর স্কন্ধে ভর দিয়ে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে—"

মাথা হেঁট করিয়া মেয়ে নীরব হইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল, "জানি না বাবু কার কতখানি দোষ! তবে লক্ষ্য করেছি বিমাতা চিরজীবন পিতাকে বিজাতীয় ঘৃণা করে এসেছেন। কখনো তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন না। যাক সে কথা—তারপর তাঁরা দেশে পৌঁছালেন। সমাজের ঘৃণা এবং আইনের দণ্ড তাঁর মাথার উপর উদ্যত হোল। পলাতক সিপাহি হিসাবে গভর্ণমেন্টের আদেশ তিনি অবিলম্বে ধৃত হলেন, দণ্ডিত হলেন, চাকরী গেল। বিমাতাকে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা গৃহে স্থান দিতে অস্বীকৃত হলেন। সমাজের নিন্দা ঘৃণার তীব্র উপদ্রব, তীব্রতর হয়ে উঠল, অশান্তি-পীড়িতা পিতামহী অভিশাপ দিলেন—'যে দেহের দ্বারা পিতা পরস্ত্রীর পবিত্রতা নাশকারী পশুকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করেছেন, সে দেহ যেন অকালে পশু দ্বারাই ধ্বংস হয়ে তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।'

দাঁড়াইতেছেন, সঙ্গীকে শ্রান্তি মোচনের অবকাশ দিতেছেন—
আবার আবার চলিতেছেন। ভদ্রলোকের কাঁধে দুখানি মোটা লুইয়ের
মহং সা ং একখানি রেশমী নামাবলী।
তাঁর আশী লিয়াছেন। কিছু দূরে আসিবার পর, পাশের বেশ্যাপল্লীর
সে অন্যমন লেষ্টার, টুপি, বুট পরিহিত একটি সৌখীন যুবক বাহির
"তোমার বিমাতা এ একটি ষোল সতের বছর বয়সের অকালপক্ক
শম্ভু সিংহ উত্তর । ছোক্‌রার পায়ের জুতা ছেঁড়া, গায়ে সাদা
অস্বীকৃত—কাজেই আমা ংয়ের র‍্যাপার।
মাতা এবং পিতামহীকে গে চলিল। যুবক মদমত্ত জীব-বিশেষের
আমাদেরই পরিবারভুক্ত স্বীকার ব ডাহিনে বাঁয়ে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে
দণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সেই যে ব্যবহার সম্বন্ধে কি সব মন্তব্য প্রকাশ
গৃহে ফেরেন নি। অনেক চেষ্টার পর বাবাজী "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি
গিয়ে তাঁকে ধরেছিলাম, বাড়ী ফেরাবার জিহ্বায় অসংলগ্ন ছন্দে,
বললেন, "এ মুখ আর কাউকে দেখাব না! তুমি হি-হি হি-হি
মায়ের আর তোমার মায়েদের ভার তোমার উপর রেখেছি, তুমি তোমা
কর্ত্তব্য পালন কর গে। তারপর পুনশ্চ সাক্ষাতের অনিচ্ছাতেই বোধ হয়—
সেই রাত্রিই দিল্লী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তারপর, আর তাঁর কোন
খবর পাই নি। পেলাম একেবারে এই টেলিগ্রামের সংবাদ, হোল
একেবারে এই শেষ সাক্ষাৎ।"

দুঃখিত হইয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প, তবু বোধ হল,
নিজের ভুলের জন্য তিনি জীবনে দারুণ অনুশোচনা ভোগ করেছেন।"

শম্ভু সিংহ বলিল, "নিরক্ষর হলেও সাধারণ নৈতিক বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান তাঁর
যথেষ্ট ছিল। জ্ঞানীর হৃদয়ে বিবেকের তাড়না বড় তীব্র বাবুসাহেব
বড় তীব্র!"

কৃষ্ণা একাদশীর চন্দ্র

ুপ্ত কলিকাতা নগরীর

বিদ্যুতের আলো পূর্ণ তেজে

রিয়া ঘরে ঘরে লোকে লেপ কাঁথা

াকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, বিনিদ্র

দিয়া বেড়াইতেছে।

এয়া দুই ব্যক্তি আহিরীটোলার ঘাটের দিকে

একজনের সন্ন্যাসী বেশ। পরণে সামান্য কোপীন ও গৈরিক চাদর। মাথায় রুক্ষ জটাজাল, গলায় রুদ্রাক্ষের এবং আরও কিসের কতকগুলা মালা। সন্ন্যাসী বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু দেহ অতিশয় সুস্থ সবল, সমুন্নত। বলিষ্ঠ যুবকের মত দীর্ঘ দ্রুত পাদক্ষেপে তিনি স্বচ্ছন্দে পথ হাঁটিতেছেন। জরার প্রভাব, শীত ঋতুর প্রভাব, সেই সাধন-সিদ্ধ পবিত্র দেহের নিকট যেন পরাজিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর মুখভাব প্রশান্ত, নির্ব্বিকার।

পিছনের লোকটি ভদ্র যুবক। গরম পুরু মলিদায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, শীতে জড় সড় হইয়া তিনি যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চলিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক চলনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার সাধ্য তাঁর ছিল না। তিনি হাঁপাইয়া পড়িতেছেন। সন্ন্যাসী মাঝে

মার্গে দাঁড়াইতেছেন, সঙ্গীকে শ্রান্তি মোচনের অবকাশ দিতেছেন—তারপর আবার চলিতেছেন। ভদ্রলোকের কাঁধে দুখানি মোটা লুইয়ের কাপড় এবং একখানি রেশমী নামাবলী।

দুজনে চলিয়াছেন। কিছু দূরে আসিবার পর, পাশের বেশ্যাপল্লীর পথ হইতে দামী অলেষ্টার, টুপি, বুট পরিহিত একটি সৌখীন যুবক বাহির হইল। তার পিছনে একটি ষোল সতের বছর বয়সের অকালপক্ক মোসাহেব শ্রেণীর ছোক্‌রা। ছোক্‌রার পায়ের জুতা ছেঁড়া, গায়ে সাদা জিনের কোট ও চকোলেট রংয়ের র‍্যাপার।

তাহারা ইহাঁদের আগে আগে চলিল। যুবক মদমত্ত জীব-বিশেষের ন্যায় অতিশয় সৌখীন ভাবে রাস্তার ডাহিনে বাঁয়ে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে চলিতে খোশ খেয়ালে কোন বেশ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে কি সব মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। অকালপক্ক মোসাহেব বাবাজী "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়" প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। জড়িত জিহ্বায় অসংলগ্ন ছন্দে, কুৎসিত রসিকতায় মুরুব্বির মনোরঞ্জন করিয়া ক্রমাগত হি-হি হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

তারা সামনের পথ দখল করিয়া অলস মন্থর গতিতে চলিতেছিল, সন্ন্যাসীর দ্রুত গমনে বাধা পড়িল। তিনি ধীরে চলিতে লাগিলেন। বেশ্যাপল্লী ফেরৎ জীব দুটির কুৎসিত রসালাপে সন্ন্যাসীর সঙ্গীর ভ্রূযুগল বিরক্তি ভাবে অলক্ষিতে কুঁচ্‌কাইয়া উঠিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রশান্ত নির্ব্বিকার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

ছোক্‌রা চলিতে চলিতে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ইহাদের দেখিল। তারপর ব্যঙ্গ ভরে বলিল, "এরা গঙ্গাস্তান করে ধম্মো কর্ত্তে যাচ্ছে। চল্‌ ফেলু খুড়ো, আমরাও গঙ্গার ঘাটে ধম্মো করি গে। এত রাত্রে ট্রাম ট্যাক্সি মিলবে না। কাঁহাতক হাঁটা যায়? আর বাড়ী গিয়ে

দোয়ার ঠ্যাঙালে তোমার বাবা-ব্যাটা গাঁক্ গাঁক্ করবে। আমার মা বেটি খাঁক্ খাঁক্ করবে, হাঙ্গামা ত কম নয়।"

ফেলু খুড়া উদার ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "বাবা ব্যাটা বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে দিব্যি বেঁচে আছে। মরবার নামটি নেই। ম'লে একবার—"

হি-হি হি-হি করিয়া হাসিয়া ছোক্‌রা সেই অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিয়া দিল। বিজ্ঞভাবে রসিকতা করিয়া বলিল, "তাহলে তোমরা ছ'টা ভাই মিলে নোটের ঘুড়ি তৈরী করে ওড়াও।"

ফেলু খুড়া সদম্ভে বলিল, "তা ত ওড়াবই! শুধু নোটের ঘুড়ি! কোম্পানির কাগজের চৌঘুড়ি বানিয়ে ওড়াব। বাবা অনেক লোকের হরে-হস্থরে অত পয়সা জমিয়েছে কার জন্তে? আমাদেরই ভোগ করবার জন্তে ত? আমরা পয়সা জমিয়ে জমিয়ে ছাতা ধরাব না। নিজে ভোগ করব, দশজনকে ভোগ করাব। তবেই ত নাম হবে। দেখিস্, আমাদের নবাবী!"

নিশ্বাস ফেলিয়া ছোক্‌রা বলিল, "আমার বাবা কাকারাও তাই করে গেছে। ঠাকুর্দ্দার ঢের টাকা ছিল। মুর্গির হাড় রোজ আমাদের বাড়ী থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি চাকররা ফেল্‌ত। কত লোকেই পোলাও কালিয়া খেয়ে যেত তার ঠিক নেই! তারা সখের দায়েই সব উড়িয়েছে!"

যুবক অবজ্ঞা ভরে বলিল, "যা যা আর 'চ্যাং বড়াং'এ পণ্য করিস্ নি। ভারি ত মুর্গি তারা খেয়েছে। আমি যখন বিষয়ের মালিক হব, তখন দেখিস, কত মুর্গি কত মাটন তোদের খাওয়াই।"

হি-হি হি-হি হাসিয়া ছোক্‌রা বলিল, "বাবা তোমার বাপ ঠাকুর্দ্দা হাড়-কিপ্পিন। তুমি আমার সা-খরচে হবে। সারদাসুন্দরী বল্‌লে, পেলিটি হোটেলের খানা—"

মুখ ভার করিয়া ফেলু খুড়া বলিল, "কি করব? আজ বাবার আয়রণ চেষ্টের চাবি চুরি করতে পারি নি যে। পারলে তোদের চুটিয়ে খানা দিতাম। বাবাকে মরতে দে, তারপর দেখে নিস্!"

সন্ন্যাসী ফুটপাথ হইতে নামিলেন। সঙ্গীও নীরবে তাঁর পশ্চাদানুসরণ করিলেন। দ্রুত পদে ইহাদের অতিক্রম করিয়া তাঁরা আবার ফুটপাথে উঠিলেন। সামনের পথ ধরিয়া দ্রুত গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন।

ছোক্‌রা শ্লেষ ভরে বলিল, "ব্যাটারা চলেছে ছাখো! যেন মোটর ছুটছে!"

অকস্মাৎ অর্থহীন বিদ্বেষে যুবকের মন পরিপূর্ণ হইল! রূঢ়স্বরে বলিল, "লাগে! চল, গঙ্গার ঘাটেই যাব! আমাদের হারায় কে?"

ফেলু খুড়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। গুণধর ভাই-পো পিছু ডাকিয়া বলিল, "দাঁড়াও খুড়ো একটা সিগ্রেট্ দাও, আগে ধরাই।"

সিগারেট ধরাইয়া উভয়ে মুখে গুঁজিয়া মহা উৎসাহে দ্রুত হাঁটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ধরা সহজ হইল না। ইহারা মোড় ঘুরিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী ও তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটি গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ছোক্‌রা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বলিল, "যাঃ খুড়ো, শিকার ভাগল্‌বা!"

রাস্তার পাশে নিরালায় বসিয়া একটি প্রৌঢ় বৌদ্ধ ভিক্ষু পালি ভাষায় স্তব স্তোত্র পাঠ করিয়া নিম্নস্বরে উপাসনা করিতেছিলেন। ফেলু খুড়া তার দিকে কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিল, "এই এক সং! তুই নামাজ পড়্‌তে পারিস্? কিম্বা সাহেবদের মত প্রেয়ার? দে জুড়ে ওর সঙ্গে!"

ছোক্‌রা তৎক্ষণাৎ অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া বৌদ্ধ উপাসককে ভ্যাংচাইয়া

বিকৃত স্বরে গান জুড়িয়া দিল। ভিক্ষু একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিছু বলিলেন না। মাথা হেঁট করিয়া নিজের উপাসনায় মন দিলেন।

সন্ন্যাসী গঙ্গায় নামিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে চাহিয়া ইহাদের কাণ্ড লক্ষ্য করিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "অজ্ঞান জীব।"

সন্ন্যাসীর সঙ্গী ঘাটের পাশে কাপড়গুলি রাখিয়া আস্তে আস্তে তীরে উঠিলেন। নিঃশব্দ পদে উপাসনা রত বৌদ্ধ ভিক্ষুকের পিছন দিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়া ছোক্‌রার সামনে দাঁড়াইলেন। মিনতির স্বরে বলিলেন, "বাবা, যে যেভাবে ভগবানকে স্মরণ কর্‌ছে, করতে দাও। কারুর আরাধনায় বিঘ্ন কোর না।"

ছোক্‌রা ব্যঙ্গ স্বরে ভ্যাংচাইয়া বলিল, "কি হয় তাতে?"

ভদ্রলোক নিম্নস্বরে বলিলেন, "ভগবানের কাছে অপরাধী হতে হয়। কেন অপরাধ অর্জ্জন করবে?"

ছোক্‌রার মুরুব্বি, ফেলু খুড়ো দু' চক্ষু কপালে তুলিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে কৃত্রিম বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "অপরাধ? অপরাধ? Who is the gentleman? তাঁর কর্টা হাত? বাড়ী কোথা?"

ভদ্রলোক চটিলেন। ক্রোধ দমন করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "মনে রাখ্‌বেন "It is not God who Judges a sinner, but his own sin." নিজের মঙ্গল চান ত সরে যান মশাই।"

ছোক্‌রা একটু দূরে সরিয়া বলিল, "তোমার বাবার রাস্তা?"

ফেলু খুড়ো অলেষ্টারের আস্তিন গুটাইয়া বীরদর্পে যুদ্ধোদ্যত হইল। ভদ্রলোক অবাক্!

দূরে গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন। হাততালি দিয়া নীরব সঙ্কেতে ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন।

ভদ্রলোক যুদ্ধের নিমন্ত্রণ অবহেলা করিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে চলিলেন। কাছে যাইতে সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিলেন, "সৎপরামর্শ গ্রহণ করবার মত মনের অবস্থা সকলের সব সময় থাকে না। নিয়তির টানে বিবেক ধ্বংস করে, অন্যায়ের পথে চলতেই অধিকাংশ মানুষ ভালবাসে। যে যার নিজের কর্ম্মফল ভোগ করছে করতে দাও। তুমি নিজের কাজে মন দাও। হিত-উপদেশ দিতে গিয়ে যদি গাল খেতে হয়, অপমান হতে হয়, মনে কষ্ট পেতে হয়—সেও অন্যায়কারীর কর্ম্মদোষ বাড়ানো হয় মাত্র। তার চেয়ে চুপ করে ভগবানের কাজ দেখে যাও।"

দূর হইতে ফেলু খুড়ো প্রবল প্রতাপে জুতা ঠুকিয়া বলিল, "এখনকার দিনে জোরেরই জয় জয়কার! "যার লাঠি তার মাটি!" যে নিম্ন হয়ে থাকে, তাকেই সবাই চেপে ধরে! পালালে কেন? চলে এস।"

সন্ন্যাসী আবার মৃদু হাসিলেন। সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনুপম, আজ তোমার ঘাতচন্দ্র। উপদ্রব সহ্য করো তোমারই মঙ্গল হবে। যাও কাপড় বদলে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে জপে বসো। এত ঠাণ্ডায় স্নান করা তোমার সহ্য হবে না। ও দিকে মন দিও না।"

শিষ্য নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুর আদেশ পালন করিলেন।

পঞ্চ

সন্ন্যাসী জলে নামিয়া স্নান করিলেন। তারপর জটা নিঙড়াইয়া ঘাটে উঠিলেন। নিম্নস্বরে সংস্কৃত স্তব পাঠ করিতে করিতে ভিজা কাপড় বদলাইয়া একখানি লুইয়ের কাপড় পড়িয়া রেশমী নামাবলীতে মস্তক আচ্ছাদন করিয়া, অনাবৃত দেহে গঙ্গার জলের নিকট আহ্নিক করিতে বসিলেন।

ভদ্রলোক মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নিজের ও গুরুর পরিত্যক্ত

কাপড়গুলি কাচিয়া অন্য লুইয়ের কাপড় খানি পরিলেন। ভিজা কাপড়গুলি নিকটে রাখিয়া, গুরুর অদূরে বসিয়া তিনিও আহ্নিক পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী নিজের কাজ করিতে করিতে সহসা থামিলেন। শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনুপম, শীতের ভোরে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য করা তোমার অভ্যাস নেই। বাড়ী গিয়ে—"

যোড় হাতে বাধা দিয়া শিষ্য ব্যগ্র অনুনয়ের সহিত বলিল, "আপনি স্নান করে, অনাবৃত দেহে এ শীত সহ্য করতে পারছেন। আমার গায়ে মলিদা ঢাকা আছে বাবা। আমি কতটুকু আর সহ্য করব? বেশ নির্জ্জনতা আছে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত, এখানেই আমায় কাজ করবার অনুমতি দিন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে বাড়ী যাব।"

সন্ন্যাসী কিছু বলিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া আচমন করিয়া পুনরায় চোখ বুজিলেন।

প্রত্যেকেই একাগ্র তন্ময়ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর কাটিল। ঘাটে জন-সমাগম নাই। দূরে সদ্যঃ সুপ্তোত্থিত নৌকার মাঝিদের অস্ফুট সাড়া শব্দ মাত্র শোনা যাইতেছে। বহুদূরে রাস্তায় দু' একটা মোটর বা গাড়ী চলাচলের অস্পষ্ট আওয়াজ কদাচিৎ পাওয়া যাইতেছে।

নেত্র

গুরুর দেহ নিস্পন্দ স্থির। তিনি গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাইতেছে না। দূরের বিদ্যুদালোকে শুধু পিছন দিকটা মাত্র দেখা যাইতেছিল। কঠিন স্থির দেহ, যেন প্রাণহীন পাষাণ মূর্ত্তির মত শোভা পাইতেছিল।

স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল

শিষ্য তন্ময় চিত্তে নিজের কাজ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিলেন। তারপর আবার চোখ বুজিয়া জপ করিতেছিলেন।

সেই নীরবতার জমাট শান্তি ভাঙ্গিয়া সহসা অতি নিকটে কে বিকট তার স্বরে গাহিয়া উঠিল, "বাবু বেড়ানা বেড়ানা—"

সন্ন্যাসীর একাগ্রতা ভঙ্গ হইল না, কিন্তু ভদ্রলোক ভয়ানক চমকাইয়া উঠিলেন! চোখ মেলিয়া দেখিলেন সেই ছোকরা অদূরে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া তাহাদের ভেংচাইতেছে এবং বিকট স্বরে চেঁচাইতেছে! তার নিকটে দাঁড়াইয়া অলেষ্টার টুপি পরিহিত সেই সৌখীন যুবক কৌতুক ভরে হাসিতেছে এবং সিগারেট টানিতে টানিতে চোখের ইঙ্গিতে ছেলেটিকে উৎসাহ দিতেছে।

ভদ্রলোকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তবু তিনি কষ্টে মনস্থির করিয়া আবার চোখ বুজাইলেন, এবং জপে মন দিবার চেষ্টা করিলেন। ছেলেটি মহা উৎসাহে প্রচণ্ড চীৎকারে একটানা ছন্দে গাহিতে লাগিল—

জপ তপ কর কি মরণে হুঁসিয়ার
যমদূতে করিবে তাড়না।
রাম রহিম না' জুদা কর
দিলকো সাচ্চা রাখ' জী
লেও সখী দেও ভর পিয়ালা
পিলা দারু পি—"

এই অপরূপ সঙ্গীতছন্দ যোজনার অলৌকিক প্রতিভায় এবং উৎকট চীৎকারের দাপটে বেচারার দম বন্ধ হইয়া আসিল, তবু সে চীৎকারের মাত্রা উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে তুলিবার চেষ্টার ত্রুটি রাখিল না। তার গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ভদ্রলোক কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে নমঃ নমঃ করিয়া জপের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছেলেটির নিকটে গিয়া ক্ষোভ কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "বাপু, আমি সৎপরামর্শ দিতে গিয়ে তোমাদের কাছে অপরাধী হয়েছি, ঘাট মানছি। আমার গুরুর ধ্যানে ব্যাঘাত করো না, অনুগ্রহ করে চীৎকারটা বন্ধ করো "

যুবক সিগারেটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়া প্রবল মুরুব্বিয়ানার সহিত বলিল, "জায়গাটা পাবলিকের মশাই। চীৎকার সহ্য করতে না পারেন, এখান থেকে চলে যান। ওর খুশি ও চ্যাঁচাবে, বেশ করবে।"

ভদ্রলোকের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। ধৈর্য্য হারাইয়া তিনি ঘুসি উঠাইলেন, মুহূর্ত্তে ধ্যান-মগ্ন গুরুর ধ্যান ভাঙিল! দৃঢ় আদেশের স্বরে তিনি বলিলেন, "না, না।"

মুহূর্ত্তে যেন অদৃশ্য লৌহশৃঙ্খলে শিষ্যের হাত পা বাঁধা পড়িল! দৃঢ়-মুষ্টি শিথিল হইল, উদ্যত হস্ত নামিয়া পড়িল!

তারপর ভদ্রলোক কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই অলেষ্টার পরিহিত ফেলু খুড়ো ধাঁ করিয়া তাঁর গালে এক চড় বসাইল। উদ্ধত দর্পে বলিল, "ঘুসি উঠানো হচ্ছে? ছোট লোক! তোকে পুলিশে দেব। মেরে ছাখ, এখনই ফৌজদারি মাঁমলা জুড়ে দেব!"

ভদ্রলোক আঘাত খাইয়া স্তব্ধ। আঘাতকারীকে কিছু বলিলেন না। শুধু অনুমতি-প্রার্থী দৃষ্টিতে গুরুর দিকে চাহিলেন। গুরু করুণা ছল ছল নয়নে শিষ্যের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন। নীরব সঙ্কেতে নিকটে ডাকিলেন।

নিষ্ফল ক্রোধে ক্ষোভে ভদ্রলোকের চোখে জল আসিল। তবু তিনি ফিরিলেন, গুরুর কাছে আসিয়া বসিলেন। গুরু কিছু বলিলেন না, শুধু সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লাঞ্ছিতের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা দৃষ্টি হানিয়া বিজয়ী ফেলু খুড়ো নিজের অনুচরের উদ্দেশে বীরদর্পে বলিল, "নে, তুই আবার গা। যত পারিস্ চীৎকার কর। ব্যাটারা কি করে দেখি!"

ছোক্‌রা পরম উল্লাসে হি-হি হি-হি করিয়া হাসিয়া গর্দ্দভ চীৎকারে গান ধরিল—

"চল গরু দুজন যাই পারে।
তোমার ল্যাজ ধরে পার হব আমি
চড়্‌ব না'ক ইষ্টিমারে।"

শিষ্য ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন, কিন্তু গুরু হাসিলেন। শিষ্যের মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহস্বরে বলিলেন, "অনর্থক শিরঃপীড়া সৃষ্টি কোর না। বাসায় চল, এখানে বড় কোলাহল।"

ক্ষুব্ধ-ব্যথিত স্বরে শিষ্য বলিলেন, "আমায় ত কাজ কর্‌তে দিলে না, আপনারও কাজে ব্যাঘাত ঘটালে বাবা?"

সন্ন্যাসী শান্তভাবে বলিলেন, "এখানে বসাই আমাদের ভুল হয়েছে। বাসায় চল, সেইখানে নিত্যক্রিয়া শেষ করা যাবে। আজ রবিবার, তোমার আফিস বন্ধ, সময়ের অভাব হবে না, ওঠ।"

উভয়ে উঠিলেন। শিষ্য দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিম্ন স্বরে বলিলেন, "ওরা ঠিক বলেছে—এখনকার কালে জোরেরই জয় জয়কার! Might is right—খাঁটি সত্যি কথা। কেউ এক গালে চড় মার্‌লে আর এক গাল ঘুরিয়ে দাও—একথা বলা যীশুখৃষ্টের সাজে, আমাদের সাজে না। আপনার শুদ্ধ ক্রিয়ার ব্যাঘাত! ছোঁড়া দুটোকে ঘা কতক দিতে পার্‌লে আমার বড় শান্তি হোত!"

স্মিতহাস্যে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তাতে ওদের কর্ম্মফলের ভোগ কেড়ে

নেওয়া হোত, তোমার শাস্তি ভোগ হোত মাত্র, এ ছাড়া কোনও লাভ ছিল না। ক্রোধ ছাড়, ভগবানের নাম স্মরণ কর। সহ্য করাই উত্তম উপায়।"

তাঁহাদের উঠিতে দেখিয়া বিজয়ী বীরদ্বয় হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর উভয়ে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল, ছোকরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া সদর রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। ফেলু খুড়ো ঘাটের একপাশে দাঁড়াইয়া ক্রূর দৃষ্টিতে উভয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। শীতকাল, তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটে নাই। রাস্তায় বাতি জ্বলিতেছে। সদ্যঃ জাগ্রত কুলি মজুর শ্রমজীবির দল ব্যস্ত হইয়া কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে ছুটিতেছে। ময়লা ফেলা গাড়ী সশব্দে চালাইয়া, ধাঙড়েরা পথ পরিষ্কার করিতে লাগিয়াছে। স্নানার্থী নরনারী দলে দলে ঘাটের অভিমুখে আসিতেছে। দোকানীরা দোকান পাট খুলিতেছে। চারিদিকে কোলাহল ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের ঢেউ উঠিয়াছে।

বেদ

ঘাটের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া ভদ্রলোক সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বলিলেন, "ভিড় ঠেলে এতটা পথ যেতে অনেক দেরী হবে। যদি অনুমতি দেন, একখানি ট্যাক্সি ধরি।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন। বলিলেন, "এত হাঁটা তোমার অভ্যাস নেই, কষ্ট হচ্ছে, নয়? কিন্তু ট্যাক্সি ত এখন এখানে নেই বাবা—অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তার চেয়ে আর একটু এগিয়ে চলো, ট্যাক্সি পাও, ধরো।"

দুজনে ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সামনের চৌমাথার মোড়ে আসিয়াছেন—সহসা বোঁ করিয়া একটা ঢিল আসিয়া সন্ন্যাসীর কপালে লাগিল। সন্ন্যাসী চমকাইলেন। বাঁ হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিলেন।

পিছনে ভদ্রলোক থমকিয়া দাঁড়াইলেন, আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "আহা হা—কে এমন কাজ করলে? লেগেছে? খুব লেগেছে?" বলিতে বলিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অন্য পাশের ফুটপাথে চলন্ত পথিকদের আড়ালে সেই ছোকরা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। গুরুর দৃষ্টি তাকেই অনুসরণ করিতেছে।

ভদ্রলোক ক্ষিপ্তস্বরে বলিলেন, "ওই! ওরই কাজ! যা থাকে কপালে, আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন।"

ভদ্রলোক সেই দিকে ছুটিতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্র হস্তে তাঁকে ধরিলেন। শান্ত দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আজ ওরই একদিন! কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয়। যেতে হবে না। স্থির হও।"

পিছনে ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া ফেলু খুড়ো সিগারেট টানিতে টানিতে হাসিমুখে ছোকরার উদ্দেশে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল। ছোকরা ভিড়ের আড়াল দিয়া লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে চকিতে অদৃশ্য হইল।

একজন প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী স্নান করিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসী তার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "বাবা, একটু জল দেবে?"

লোকটি বিনাবাক্যে হাতে জল দিল। জল লইয়া নিজের কপালটা সন্ন্যাসী ধুইয়া ফেলিলেন। ভদ্রলোক দেখিলেন তাঁর কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

সন্ন্যাসী তখনও তাঁর হাত ধরিয়া আছেন। ক্ষুব্ধ অনুনয়ের স্বরে

ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনার কপাল ফাটিয়ে রক্ত বের করেছে! অনুমতি দিন বাবা—ছাড়ুন; ছোঁড়াকে পুলিশে দিই।"

শান্ত হাস্যে সন্ন্যাসী বলিলেন, "মানুষের কাছে বিচার প্রার্থী হবার সময় আমার নেই অনুপম। চল বাসায়। আমার নিত্যক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়েছে, তার প্রতিফল একটু ভোগ করতে হবে বৈ কি! এইটুকুর ওপর দিয়ে যদি খণ্ডে যায়, তাহলে গুরুদেবের যথেষ্ট কৃপা বলে মনে করব।"

সন্ন্যাসী শিষ্যের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সহসা পিছনে প্রবল কোলাহল শোনা গেল। চলিতে চলিতে অনুপম বাবু মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। দেখিলেন সেই অলেষ্টার-পরিহিত ফেলু খুড়োর সঙ্গে দুজন কনেষ্টবলের রীতিমত মারামারি সুরু হইয়াছে। উত্তেজিত জনতা ফেলু খুড়োর ঘাড়ে মুখে কিল চড় ঘুসি বর্ষণ করিতেছে! ফেলু খুড়োর টুপি থেৎলাইয়াছে, অলেষ্টারের পকেট ও কলার ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু সবুট পদাঘাত তখনও সমান তেজে চলিতেছে!

পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল কনেষ্টবলের হাতে ফেলু খুড়ো বন্দী হইয়াছে! বীরদর্প—শান্ত হইয়াছে। হাত পা ছুড়িবার সামর্থ্য আর নাই। শুধু কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিতেছে।

জনতার ভিতর হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন ভদ্রলোক বাহিরে আসিতেছিলেন। বিস্ময়োত্তেজিত অনুপমবাবু দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হয়েছিল মশাই? ছোক্‌রা করেছিল কি?"

ভদ্রলোক দূর হইতে ক্রুদ্ধ-বিরক্ত স্বরে কি বলিলেন স্পষ্ট বোঝা গেল না। অস্পষ্ট ভাবে শুধু গোটাকতক কথা শোনা গেল।…"চাষা চোয়াড়ের বাচ্ছা…আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে…চোয়াড়ে স্বভাব যাবে কোথা? মেয়েদের নাইবার ঘাটে…ভদ্রলোকের মেয়ে…যেন সোনাগাছির খেম্‌টি

পেয়েছে।···ঘরে মা-মাসি নেই? তাদের খেম্‌টি নাচিয়ে আমোদ কর্‌গে যা না···"

অনুপমবাবু হতবুদ্ধি হইলেন! সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনুন বাবা—"

সন্ন্যাসী নির্ব্বিকার মুখে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "শোনবার সময় নেই। প্রত্যেকে তার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভুগছে, কত শুনবে? কত দেখবে? নিজের কাজে মন দাও।"

অনুপমবাবু লজ্জিত, স্তব্ধ!

কয়েক পা যাইতেই ভোঁ করিয়া একখানা নীল রংয়ের খালি ট্যাক্সি পাশ দিয়া চলিয়া গেল। অনুপমবাবু হাত তুলিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, চালক গ্রাহ্য করিল না। অনুপমবাবু বিরক্ত হইলেন, সন্ন্যাসী শুধু মৃদু হাসিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল। এটাও খালি। অনুপমবাবু পুনশ্চ ইঙ্গিত করিলেন, ট্যাক্সি থামিল। সন্ন্যাসীকে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া অনুপমবাবু চালককে নিজের বাসার ঠিকানা বলিয়া দিলেন। চালক ট্যাক্সি ছুটাইল।

সন্ন্যাসী পিছনের আসনে বসিয়া চোখ বুজিয়া আত্ম-চিন্তায় বিভোর হইলেন। এই জনাকীর্ণ কোলাহল মুখর কলিকাতার রাজপথে অত দৃঢ়তায় চিত্ত স্থির করিবার সাধ্য অনুপমবাবুর ছিল না। তিনি চালকের পাশের আসনে বসিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। তখন চারিদিক ফর্শা হইয়া আসিয়াছে।

দু একটা মোড় ঘুরিয়া আর একটা চৌমাথার মোড়ে পৌছিতেই পাহারাওয়ালার ইঙ্গিতে ট্যাক্সি থামিল। সামনে ভীষণ জনতা, প্রচণ্ড কোলাহল। চারিদিক হইতে ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর আসিয়া

পাহারাওয়ালাদের ইঙ্গিতে পথে পথে দাঁড়াইয়াছে। ফুটপাথেও মানুষের ভীড় জমিয়াছে, জনতা ভেদ করিয়া কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জনতার মাঝখানে সেই নীল রংয়ের মোটরগাড়ীখানা দাঁড়াইয়া আছে।

অনুপমবাবু ক্ষুব্ধ চিত্তে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আবার বিভ্রাট! নারায়ণ!"

সন্ন্যাসীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। শান্তভাবে চোখ বুজাইয়া, যেমন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তেমনি রহিলেন।

ভিড় সরাইয়া কয়জন লোক ধরাধরি করিয়া একজন লোককে তুলিয়া ফুটপাতে শোয়াইল। তার মুখের উপর দিয়া মোটরের চাকা চলিয়া গিয়াছে, মুখখানা থেঁৎলাইয়া পিষিয়া রক্তে রক্তাকার হইয়া এমনি বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে মুখখানা চিনিবার যো নাই। ডান হাতটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোমরের হাড় পিষিয়া গিয়াছে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এদিকে ওদিকে ঘাড় নাড়িয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে গোঁ গোঁ করিতেছে। বীভৎস দৃশ্য।

জনতা ভাঙ্গিয়া কয়জন লোক অনুপমবাবুর ট্যাক্সির পাশ কাটাইয়া বলিতে বলিতে গেল, "অতি হতভাগা বদ্ ছেলে। ক্রমাগত ট্রাম ট্যাক্সির মুখের আগে পাল্লা দিয়ে ছুটছে! কেন রে বাবা? ফুটপাত দিয়ে চল্‌তে কি হয়েছিল? এখন নিজে ত মোল, সোফারটাকেও মেরে গেল।"

আর একজন বলিল, "ছোঁড়াটা আমাদেরই পাড়ার ছেলে মশাই "মা খায় ধান ভেনে, ব্যাটা খায় এলাচ কিনে" সেই প্যাটার্ণের ছেলে। বাপ বখামো করে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে মরে গেছে, মা লোকের বাড়ী রাঁধুনী-গিরি করে ছেলেকে লেখা পড়া শেখাচ্ছিল। উনি এখন বড়লোকের ছেলেদের মোসাহেব হয়ে একেবারে উচ্ছন্ন গেছেন! কাল রাত্রেও বেশ্যাবাড়ী গেছল মশাই—"

পিছন হইতে আর একজন বলিল, "ওর সেই ফেলু খুড়োকে খবর দাও হে—"

অন্যব্যক্তি উত্তর দিল, "ওর চোদ্দ পুরুষের খুড়ো। সে চাষার ছেলে ও বামুনের ঘরের—"

তাহারা চলিয়া গেল। অনুপমবাবুর সর্ব্ব শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে তাঁর সাহস হইল না। তিনি ভীত দৃষ্টিতে ফুটপাথের সেই আহত দেহটা ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, জনতার ঠেসাঠেসিতে প্রথমটা দেখিতে পাইলেন না। জনতা একটু পাৎলা হইলে ঘাড় ঝুঁকাইয়া—ভিড়ের ফাঁক দিয়া দেখিলেন—রক্তে কাদায় বিকৃতরূপ ধারণ করিলেও আহতের দেহে সেই শাদা জিনের কোট, সেই চকোলেট্ রংয়ের গায়ের কাপড়, পায়ে সেই ছেঁড়া জুতাই বটে!

স্থান কাল ভুলিয়া আতঙ্ক-বিকল কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সেই ছোক্‌রাই ত! উঃ মুখ দিয়ে ভল্ ভল্ করে রক্ত পড়ছে, কি ভয়ঙ্কর! বাবা, দেখুন—"

ডাক শুনিয়া সন্ন্যাসী চোখ মেলিয়া চাহিলেন। তাঁর দৃষ্টি—তন্দ্রা-জড়িতাচ্ছন্নের ন্যায়। যেন গভীর নিদ্রা হইতে তিনি এই মাত্র জাগিলেন।

অনুপমবাবু ফুটপাথের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "সেই ছোক্‌রা মোটর চাপা পড়েছে। কি অবস্থা হয়েছে দেখুন—"

"জানি—" বলিয়া সন্ন্যাসী আবার চোখ বুজাইলেন। কোন দিকে চাহিলেন না, কিছুই দেখিলেন না। অনুপমবাবু অবাক!

পথের জনতা সরিয়া গেল। পথ পাইয়া ট্যাক্সি আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। মুমূর্ষুর পাশ দিয়া যখন ট্যাক্সি পার হইয়া গেল, তখন সেদিকে চাহিয়া অনুপম আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন! মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইল।—উঃ, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান, তোমার বিধান কি নিষ্ঠুর!

সন্ন্যাসী এবার নিশ্বাস ছাড়িয়া কথা কহিলেন। তন্দ্রাভারজড়িত অর্দ্ধনিমীলিত চোখে চাহিয়া, ধীরে ধীরে করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "অজ্ঞানে এসেছিল, অজ্ঞানেই চলে গেল। উন্নতির একটা সুযোগ হেলায় হারালে। উপায় নাই, সৎপরামর্শ গ্রহণ কর্‌বার সামর্থ্য ত ছিল না।"

অনুতপ্তস্বরে অনুপমবাবু বলিলেন, "আমিও মহা অজ্ঞান-জীব। একে এত বড় শাস্তি দেবার ক্ষমতা—এ পৃথিবীতে কার ছিল? এখন বুঝতে পারছি—আপনি কেন আমায় নিষেধ করেছিলেন। আজ আপনি সঙ্গে না থাকলে আমার কপালেও দুর্গতি ভোগ ছিল।"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "হাঁ, ছিল। ওরাই অত্যাচার করে তোমার দুর্ভোগটা কেড়ে নিলে! মানুষ নিজের শাস্তি, নিজের পুরস্কার নিজেই প্রস্তুত করে বাবা। দুদিন আগে কিম্বা দুদিন পরে—সকলকেই সেই স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়।"

একটু থামিয়া ধীরে ধীরে পুনশ্চ বলিলেন, "অনর্থক হিংসায়, নিরপরাধের উৎপীড়নকারী ব্যক্তি, সদ্য নাশ প্রাপ্ত হয় বাবা। ওই বড়লোকের ছেলেটির, জন্মান্তরের সৎ কর্ম্মফল যথেষ্ট ছিল। ইহজন্মের কর্ম্মদোষে সব নষ্ট করে চলেছে। আজ যেটুকু নগদ বিদায় হোল—তোমার দরুণ উপরি-পাওনা মাত্র। কিন্তু এ ছোক্‌রার অত শুভ কর্ম্মফল ছিল না। এক ছটাকের ক্ষমতা নিয়ে এক মণের ভার তুলতে গেছ্‌ল, তাই সদ্য পিষে গেল। কর্ম্মদোষে মানুষ আয়ু থাকতেও মারা যায়।

উদ্বেগ-উত্তেজিত মুখে অনুপমবাবু বলিলেন, "এ ছোঁড়াটা কি আয়ু থাকতেও মারা গেল?' মানুষ আয়ু থাকতেও মারা যায়, এ কি সত্যিই?"

অজ্ঞান শিশুর মূঢ় কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নে, জ্ঞানবান পিতা যেমন কৌতুক

বোধ করিয়া হাসেন—শিষ্যের প্রশ্নে সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল তেমনি ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইল। তিনি মুখে কোন উত্তর দিলেন না। শুধু নিজের কপালে হাত দিয়া ক্ষতমুখের রক্তধারা মুছিয়া লইয়া—সেই রক্তাক্ত করতল শিষ্যের দিকে বিস্তার করিয়া দেখাইলেন মাত্র!

শিষ্য শিহরিলেন! আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। ভীতমুখে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁর স্মরণ হইল, অপরাধীদের সৎপরামর্শ দিবার চেষ্টায়, ভগবদ্ভক্ত সাধু সুন্দর সিংহের যে বিশ্বাস বাণী তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই অখণ্ডনীয় মহাসত্য বাণী—"It is not God, who judges, a sinner, but his own sin."

দীপ্তি

১

সদর দুয়ারের ওদিক হইতে বালক ভৃত্য জগুয়া হাঁকিল, "বড়া কোঠিকো সরকারবাবু আয়া।"

সামনের নির্জ্জন ঘরে, টেবিলের কাছে চেয়ারে বিমলা বসিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে দুয়ারের পানে চাহিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিল। বিমলার দেহখানি শীর্ণ দীর্ঘ, চোখ দুটি বিষাদমাখা, দুর্ভাবনা ভারে ক্লান্ত মুখখানি শুষ্ক মলিন। কঙ্কালসার দেহের সমস্ত পেশী চর্ম্ম এমন অস্বাভাবিক ভাবে শুকাইয়া কুঁচকাইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে তাহার বয়স বাইশ কি বাহান্ন সহসা স্থির করা কঠিন। দারিদ্র্য এবং অমিতাচার—দুষ্ট জীবন যাপনের ফলে তাহার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সঞ্জীবতা যৌবনশ্রী সব যেন অকালে লুপ্তপ্রায়।

বিমলার পরিধানে আধময়লা শাড়ী ও সেমিজ। হাতে কয়েক-গাছি কাঁচের চুড়ি ও 'নোয়া'। সীমন্তে সিন্দুর।

টেবিলে একটা সেলাইয়ের কল, এবং তার চার পাশে রেশমী ও সুতার নানা রকম কাপড় বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া পাট করিয়া থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে। সে গুলোর দিকে চাহিয়া, মাঝে মাঝে দু একটা অর্দ্ধ সমাপ্ত সেলাই হাতে লইয়া বিমলা অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করিতেছে। তারপর আবার দুয়ারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল।

সহসা জগুয়ার ডাক কানে পৌঁছিল। 'বড়া কোঠির' অর্থ বিমলা বুঝিল, পাশের বড় বাড়ীর মালিক হাইকোর্টে ওকালতি করেন, সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন। পূজার ছুটিতে অন্যবারের মত এবারও কাশীধামে বায়ুসেবনের জন্য আসিয়াছে। তাঁহার নাংনী, দীপ্তি সম্প্রতি আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতেছে। বিমলার সঙ্গে তাহাদের কি দূর কুটুম্বিতা আছে।

সুতরাং বড়া কোঠির অর্থ সহজে বোঝা গেল, কিন্তু সরকার-বাবুটিকে এবং এই ঠিক দুপুরের সময় এখানে তাঁহার কি প্রয়োজন—তাহা বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া দৌর্ব্বল্য ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে সরকারবাবু ?"

"হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ, আমি।" বলিতে বলিতে গ্রাম্য সৌন্দর্য্য-প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টায় কৃত্রিম হাসিমাখা মুখে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল।

বিমলা চাহিয়া দেখিল, লোকটির চেহারা যেমন বেঁটে খাটো, তেমনি হৃষ্ট পুষ্ট। বিশেষতঃ দেহের মধ্যদেশ এত বেশী মাত্রায় পরিপুষ্ট যে অত খর্ব্ব দেহে অত বড় ভুঁড়ি নিতান্তই বেমানান ঠেকে। লোকটির হাত পা কয়খানি দেহের অনুপাতে খর্ব্ব ও স্থূল। মাথার পিছনে গাছকতক কাঁচা পাকা চুল, সামনে প্রকাণ্ড টাক। দাড়ি গোঁফ ক্ষৌর নির্ম্মূল। মাংসল সুগোল মুখমণ্ডলের বৃহৎ পরিধির মাঝে ছোট ছোট চোখ, ছোট কপাল এবং দুই পাশে ঠেলিয়া বাহির হওয়া চোয়ালের অতি-প্রশস্ততা দেখিতে কেমন শোভন, সে কথা না বলাই ভাল। লোকটির চলিবার কায়দায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য এবং ধীরতা প্রকাশের বেশ একটা চেষ্টা ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র চক্ষু দুটির তীব্র চঞ্চল দৃষ্টিতে, অসার দম্ভপ্রিয়তা, নির্লজ্জ ধূর্ত্ততা, খলতা ও লোভের পরিচয় যেন জাজ্বল্যমান।

লোকটির নাকে ও কপালে সুক্ষ্ম রচিত তিলক। গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা। পরণে খাট ধুতি, হাত কাটা ফতুয়া, কাঁধে উড়ানি। পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা।

লোকটি ঘরে ঢুকিতে বিমলা একটু থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সসঙ্কোচে বলিল, "ও বাড়ী থেকে আসছেন? বসুন!"

লোকটি নিকটস্থ বেতের মোড়ায় বসিলেন। দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনাবশ্যক ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "কই, মাঠাকরুণটি কই?"

ভিতর মহলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বিমলা বলিল, "খেতে গেছেন। কি দরকার জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

লোকটি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "দরকার? না, এমন কিছু নয়। এই--এই দিক যে বাচ্ছিলাম, তাই একবার এলাম। উকীলবাবুর অর্ডারি জামাগুলা তৈরী হয়েছে কি?"

বিমলা নিজের চেয়ারে বসিল। সেলায়ের কলের ঢাকা খুলিতে খুলিতে বলিল, "প্রায় একটু বাকী আছে, আজই শেষ করে পাঠানো যাবে।"

বিমলাকে কলের ঢাকা খুলিতে দেখিয়া লোকটি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলেন। একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি—আপনিও সেলাই করতে জানেন বুঝি?"

কলের ছুঁচে সূতা পরাইতে পরাইতে বিমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

মোড়াটা টানিয়া টেবিলের কাছে আগাইয়া আসিয়া লোকটি সপ্রশ্ন ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কই সেলাই করুন ত, দেখি।"

বিমলা একটা অসমাপ্ত সেলাই কলে জুড়িয়া কল চালাইতে লাগিল।

লোকটি খানিক চাহিয়া দেখিলেন। তারপর দারুণ আক্ষেপভরা

উত্তেজনার সহিত নিজমনে বলিতে লাগিলেন, "নাঃ, মেয়েদের কোন কাজ আর বাকী রইল না। সকল দিকে এরা পুরুষের টেক্কা দিয়ে চলেছে। আর আমার বড় ছেলেটা। ব্যাটাছেলে হলে কি হবে? তিন তিনবার পাশ দিয়েও পাশ হতে পারলে না। লোকের কাছে বলতে দুঃখু হয়। এদিকে ব্যাটা বিয়ে করেছে, দুটো মেয়ে হয়েছে, শুধু পাশের বেলা অষ্টরম্ভা। আর এই সব মেয়ে, এরা কি না করছে? এরা খটাখট্ কল চালাচ্ছে, টপাটপ্ পাশ করছে। বাবুর নাৎনী দীপ্তিকে জানেন ত? সে বি-এ পাশের পড়া পড়ছে গা। কম কথা? পুরুষদের গালে চুণকালী দিচ্ছে। তাতেও লজ্জা নেই।"

লজ্জাটা যে কাহার নাই, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না। কিন্তু বিমলা সত্যই লজ্জিত হইল। এই লোকটির আক্ষেপের মাঝে যে ঈর্ষাপ্রবণ মনের অক্ষম আক্রোশ-দিগ্ধ মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইল, তাহার সামনে বিমলা মাথা তুলিয়া বসিতে কুণ্ঠা বোধ করিল। কৌতূহলী লোকটির আবদার রক্ষা করিবার জন্য সরলচিত্তে সেলাই করিয়া দেখানো যে তাহার উচিত হয় নাই—লোকটির জাতীয় গৌরব অভিমানে তাহাতে কাল্পনিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে, বা অক্ষম পুত্রের জন্য বেদনায় অধীর হইবার আশঙ্কা আছে, একথা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারে নাই বলিয়া মনে মনে ক্ষোভবোধ করিল।

সেলাই শেষ হইলে সেটা বাহির করিয়া বিমলা আর একটা সেলাই কলে জুড়িল। লোকটি সদ্যঃ সমাপ্ত সেলাইটা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া বার বার ডাহিনে বাঁয়ে ঘাড় কাৎ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলাইটা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর হতাশক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "নাঃ। কোথাও একটু বাঁকা চোরা নাই। ঠিক সোজা লাইন হয়েছে।"

বাহিরের দিকের দুয়ারের কাছে সেই সময় নরম জুতার খুট্‌ খুট্‌ শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তে পর্দ্দা সরাইয়া, একজন আঠারো উনিশ বৎসর বয়সের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকিল। মেয়েটির চেহারা একাহারা লম্বা, সুগঠিত। মুখশ্রী প্রখর বুদ্ধিশ্রী দীপ্ত, উজ্জ্বল চক্ষু দুটি কৌতুক-চঞ্চল। পরণে সাধারণ শাড়ী সেমিজ, চোখে চশমা, হাতে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার, পায়ে জুতা। ঈষৎ কুঞ্চিত, দীর্ঘ কেশ শোভিত, অনাবৃত মাথা, এবং শাদা সিঁথা মেয়েটির কুমারীত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে।

মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সরকারমশাই। আপনি।"

২

লোকটি শশব্যস্তে বলিলেন, "কেন কেন? কর্ত্তা আমায় ডাকছেন?"

"না, ডাকেন নি। কিন্তু প্রমীলার রাজ্যে আপনি। আশ্চর্য্য ত।" আমি গিয়ে দান্নিকে বলে দেব।"

"দান্নি"—অর্থাৎ 'দাদামণি' শব্দের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা অপভ্রংশ।

লোকটি মহা অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, "না না বোল নি, বোল নি। তাঁর জামাগুলো কেমন সেলাই হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি।"

মেয়েটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "টাকা ধারদেনেওয়ালা শিকার খুঁজতে আসেন নি ত? ব্যস, তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত। এবার সরে পড়ুন, কেন না আমি এসেছি।"

তটস্থ হইয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। কর্ত্তার কাছেই যাচ্ছি, মনে করলুম—জামাগুলো তৈরী হয়ে থাকে ত, হাতে করে নিয়ে যাই।"

মেয়েটি অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিল, "মাথায় করে নিয়ে গেলেও কিছু হবে না। ওসব যত্ন আত্তির ঘুসে তাঁকে ভোলাতে পারবেন না। যদি তিনি ভালমানুষি করে ভোলেন, আমি ভুলব না। দাদ্বিকে স্পষ্ট বলেছি, যদি তিনি পাপকে প্রশ্রয় দেন, আমি তাঁকে পুলিশে দেব।"

সরকার মহাশয়ের চক্ষে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সত্রাসে বলিলেন, "পুলিশে দেবে কর্ত্তাকে?"

মেয়েটি অম্লানবদনে বলিল, "নিশ্চয়। দুটি অসহায় বিধবা ভাদ্র-বৌকে ফাঁকি দিয়ে, তাদের সম্পত্তি আপনি যখন গলাধঃকরণ করেছেন, তখন দাদ্বির মত ভদ্রলোকের উচিত, আপনার গলায় আঙুল দিয়ে সেগুলা টেনে বের করা। তা যদি তিনি না করেন, তা হলে আমি তাঁকে ছাড়ব না। বাবা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জ্যাঠামশাই সাব্ জজ্, কাজেই আইনের মজা আমিও কিছু কিছু বুঝি। আমি তাঁকেও দেখ্‌ব, আপনাকেও দেখ্‌ব।"

সরকার মহাশয়ের যেন শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। মুমূর্ষু রোগীর মত টানিয়া টানিয়া শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "এ্যাঁ এ্যাঁ—একি কথা? দাদামশাই, গণ্যি মান্যি লোক তাঁকে দেবে পুলিশে। এ্যাঁ, একি মেয়েমানুষ।"

স্মিত মুখে মেয়েটি বলিল, "হ্যাঁ, মনে আছে আমি মেয়েমানুষ। আপনাদের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা। যেমন আপনার বিধবা ভাদ্র-বৌ দুটি—"

"তা—তা—তাদের নাম কোর নি, কোর নি। তারা কি ভদ্দর-লোকের মেয়ে? আমার নামে নালিশ—ও-ও ওয়ারেণ্ট বের করা, এ কি ভদ্দতা? আমি ভাসুর গুরুজন—" ক্রোধের উত্তেজনায় সরকার মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল, "নিজের মান নিজের কাছে সরকার মশাই। আজ আইনের তাড়া খেয়ে ভাসুর গুরুজন সেজে মানের কান্না কাঁদলে চলবে কেন? সময়ে নিজের গুরুত্ব, মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।"

"তু—তু—তুমি জান না সব কথা। তারা পাজী ছোটলোক—" ক্রোধের আতিশয্যে সরকার মহাশয়ের তোৎলামির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বলিলেন, "অ—অতি ছোটলোক।"

"যে হেতু তারা ন্যায্য প্রাপ্যের অধিকার দাবী করে। জানি সব। গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেছেন, তিলক কেটেছেন, ঘটা করে হরিনামের মালা জপ করেন, সব ভাল। ও গুলোকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু ওতে ভণ্ডামী জোচ্চুরি নৃশংসতা ঢাকা পড়ে না। লোকের চোখ আছে, আড়ালে চুপি চুপি সত্য কথা বলে, এমন লোকও আমি দেখেছি।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সেই শহুরে বাবু গুলো ত? তারা বলবেই ত। জ্ঞাতি শত্তুর কিনা। থাকত গাঁয়ে, ত দেখে নিতাম। চালে আগুন ধরিয়ে দিতাম, খুন করতাম। কে ধরত আমায়? গায়েও লেখা থাকত না। বলে কত অমন পার করে দিছি—"

"স্বীকারোক্তিগুলা অত্যন্ত স্পষ্ট হচ্ছে, বিমলাদি সাক্ষী। ভাসুর বৌদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবেন, না এবার আমিই পুলিশ ডাকব?" মেয়েটির কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কঠিন!

দমিয়া গিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "কেন?"

"নৈতিক বুদ্ধি আর সৎসাহসের মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষেরই আছে! আপনার মত মানুষকে জেলখানার বাইরে থাকতে

দিলে শুধু পতি পুত্রহীনা ভদ্রবৌদের ক্ষতি নয়, সামাজিক শান্তিরও ব্যাঘাত। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, তখন আঙ্গুল বাঁকাতে মানুষ বাধ্য হয়, যান।" সে দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাইল।

মুখ আঁধার করিয়া সরকারমশাই বাহিরে যাইতে যাইতে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন বোঝা গেল না। তিনি প্রস্থান করিলে মেয়েটি ধীরে সুস্থে একখানি মাদুর মেঝেয় বিছাইয়া শয়ন করিল। বিমলা হতবুদ্ধির মত নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি স্মিতমুখে বলিল, "এবার তুমি সেলাই কর বিমলাদি, আর ত্যক্ত হবার কারণ নেই।"

৩

ভিতরের বারেণ্ডা হইতে শুভ্র বসনা প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকিয়া, নিঃশব্দে সস্নেহ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিলেন। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "কিঞ্চিৎ জ্যাঠামো করছিলাম। আপনি শুনতে পেয়েছেন বোধ হয়? বারেণ্ডায় ছিলেন ত?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "কি করি? ঘরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। দীপ্তি, আমার বাড়ীতে ভদ্রলোকের অপমান, এর জন্যে আমিই ত দায়ী।"

দীপ্তি বলিল, "আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি বড়দি। দারির সামনে একটু সমীহ করে চলতে হয়, মনের সুখে সব কথা স্পষ্ট করে সরকারমশাইকে বলতে পারি নে। আজ সুবিধে মত চাটিখানি সৎপরামর্শ দিলাম।"

বড়দি এ পাড়ার সকলেরই বড়দি। দীর্ঘকাল হইতে বিধবা মা ও মাতামহীর সহিত কাশীবাস করিতেছেন। মা ও মাতামহী এখন

পরলোকে। উত্তরাধিকার সূত্রে বড়দি মাতামহীর বাড়ীর অর্দ্ধাংশের অধিকার লাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধাংশ মাসতুত বোন বিমলার অধিকার ভুক্ত। বিমলা স্বামীপুত্র কন্যা লইয়া সেখানে থাকে। বড়দি জামা কাট ছাঁট সেলাই করিয়া দোকানে চালান দিয়া নিজের খরচ চালান। বিমলার স্বামী পূর্ব্বে কোথায় চাকরি করিতেন কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃ দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় চাকরিটি ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া কয়েক বৎসর নির্বিঘ্নে দাম্পত্য সুখভোগ, এবং সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। সঞ্চিত পুঁজি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতেছে, মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইতেছে, ছেলেরা পড়িবার যোগ্য হইতেছে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী ভদ্রলোকটি এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ভগবানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু বিমলা দিনে দিনে উদ্বেগে শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। নিরুপায় হইয়া সম্প্রতি সে বড়দির শরণাগত হইয়াছে। কাট ছাঁট শিখিয়া অবসরকালে কিছু কিছু সেলাই করিয়া, এইদিক হইতে যৎসামান্য উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে।

দীপ্তির কথার উত্তরে বড়দি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিভীষণের দুর্ব্বুদ্ধি ধরেছিল, তাই সে দাদা রাবণকে আপন জন ঠাউরে দরদ করে রামনাম জপাতে গিয়েছিল। ফলং—"

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল, "বক্ষে পদাঘাত লাভ! সরকারমশাইও আমার মুণ্ডপাতদানে বঞ্চিত করবেন না, নিশ্চিন্ত আছি। চাকরদের আড্ডায় গিয়ে খবর নিন, শুনবেন—ঘোরতর পরাক্রমে তিনি সেখানে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন।"

প্রৌঢ়া কয়েকটা সেলাই বাছিয়া বিমলাকে সেলাই করিতে দিয়া দীপ্তির পাশে গিয়া শুইলেন। স্মিতমুখে বলিলেন, "জীবনে যদি নিজের মঙ্গল চাস, কখনো নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করিস্ নি।"

দীপ্তি বলিল, "স্বার্থের অনুরোধে পরের অপকার করতে আমার আপত্তি আছে, মনে করবেন না। আমিও আস্তে আস্তে সেয়ানা হয়ে উঠ্‌ছি। কিন্তু সরকারমশাই শ্রেণীর সজ্জনদের সুশিক্ষার বহর দেখলে মাঝে মাঝে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই—ওই যা দুর্ব্বলতা সেই সময়ে নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধনের উগ্র ইচ্ছা জেগে উঠে।"

প্রৌঢ়া একটু হাসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "এদেশের মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় যতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে নিরস্ত হওয়া উচিত, তোমার জন্যে ঠিক ততটুকু পথ মেপে দিয়ে পিতৃ-দায়িত্ব পালন করাই তোমার বাবার কর্ত্তব্য ছিল। তা তিনি করলেন না। যা শেখালেন রীতিমত যত্নের সঙ্গেই শেখালেন। এখন সামলানো দায়।"

দীপ্তি বলিল, "আমাদের এখন বুঝতে হয়েছে, লেখাপড়া শেখাটা একটা বিশেষ শ্রেণীর আলস্য-বিলাস বা ফ্যাসান মাত্র নয়। মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে, সৎ এবং ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চ্চাটা অত্যন্ত আবশ্যক। আশ্চর্য্য হয়ে এক এক সময় ভাবি— মহর্ষি মনু আজ বেঁচে থাকলে আমাদের দুর্ম্মতি দেখে কি ভয়ানক ক্রুদ্ধই না হতেন!"

বড়দি চোখ বুজিয়াই বলিলেন, "হতেন নাকি? খুব রাগী ছিলেন বুঝি?"

"তাঁর শ্লোকগুলো দেখে তাই মনে হয়। আপনাদের ইষ্টমন্ত্রকেও ছেড়ে কথা কয়েছেন ভাববেন না।"

বড়দি নিদ্রার চেষ্টা ভুলিয়া গেলেন। চোখ খুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলিস্ কিরে ঠাট্টা না কি?"

দীপ্তি সোৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাট্টা? শুনুন তবে— মনুর শ্লোক—

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়ামন্ত্রৈরিতি ধর্ম্ম ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃত মিতিস্থিতিঃ॥"

মানে, স্ত্রীলোকের জাত কর্ম্মাদি কোন মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্ত্রীলোকদের স্মৃতি বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে অধিকার নাই, কোন মন্ত্রেও এদের অধিকার নাই! এত বড় অপার কৃপার দান আপনাদের বরাতে বরাদ্দ করে গেছেন! আর কি চান?"

"বাপ! শুনলেও যে ভয় করে। মন্ত্রেও অধিকার নেই! স্ত্রীলোক-দের উপর ঠাকুরটির এত রাগ! কেন বল্‌তে পারিস্?"

দীপ্তি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বোধ হয় সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে চটাচটি হয়েছিল। রাগের মাথায় শাস্ত্র লিখ্‌তে বসে ধাঁ করে ঐ শ্লোকটা তাই ঝেড়ে দিয়েছিলেন!"

বড়দি পুনশ্চ চোখ বুজিয়া বলিলেন, "হয় ত তাই। আহা মহর্ষি যখন এ সব শাস্ত্র রচনা করেন, তুই তখন কোথায় ছিলি দীপ্তি?"

দীপ্তি পুনশ্চ শুইয়া পড়িল। আলস্য ভাঙিয়া হাই তুলিতে তুলিতে অবহেলা ভরে বলিল, "ধরে নিন—আমি তখন তাঁর গোয়ালঘরে খোঁটায় বাঁধা পড়ে জাবের সদ্ব্যবহার করছিলুম!"

বড়দি তন্দ্রালসচক্ষে স্মিতমুখে বলিলেন, "আর মহর্ষির স্ত্রী হয়ত সেদিন—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া দীপ্তি বলিল, "ধরে নিন—এই বিমলাদি যা করেন! ভাঁড়ার ঘরের অভাব অভিযোগ নিয়ে স্বামীর কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে গিয়েছিলেন। মনে করুন না, গিন্নিবান্নিরা যেমন করেন—এই বাসি পাট সেরে, নেয়ে, আহ্নিক পুজো করে, তা'পর সংসারের অভাব অনাটনের চর্চ্চা নিয়ে—স্বামীর নিশ্চিন্ত আরামে শাস্ত্র চর্চ্চার বিরুদ্ধে রীতিমত দু'কথা শুনিয়েই দিয়েছিলেন।"

আশ্বস্ত হইয়া বড়দি বলিলেন, "তাই হবে রে দীপ্তি; আহ্নিক পূজা

করে উঠেই গিন্নি গিয়ে চেঁচামেচি করে মহর্ষিকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই মহর্ষি—হুঁ তাই হবে। নইলে মন্ত্রের অধিকার কেড়ে নেবেন কেন? খামকাই কি এত রাগ হয়?"

দীপ্তি মুচকি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তার কিছু পরেই মহর্ষি আবার বিধান দিয়েছেন,

"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যানি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা
দারাধীন স্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥"

বড়দি বলিলেন, "তার মানে?'

মানেটা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দীপ্তি অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "অনুমান করা শক্ত নয় যে, সকালের ঝড় কেটে যাবার পর স্ত্রীর মাথা খোঁড়া খুঁড়িতে বাধ্য হয়ে—অপ্রসন্ন মহর্ষি খেতে এলেন। স্ত্রী খুব যত্নআত্তি করে পেট ভরে খাওয়াবার পর মহর্ষির রাগ পড়ে গেল। স্ত্রীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে আরামে এক চোট লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে, খুশীর ঝোঁকে আবার ওই বিধান বের করে ফেল্‌লেন—'দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ!"

একটু থামিয়া, ঈষৎ হাসিয়া পুনশ্চ বলিল, "নাঃ, ঋষিদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। ওই জন্যেই সরোজবাবু······না বিমলাদি?"

বিমলা সেলাই করিতে করিতে মাঝে মাঝে কল থামাইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় কথাগুলার অর্থ বুঝিবার জন্য উভয়ের মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু কিছু বুঝিতেছিল, এমন লক্ষণ আদৌ প্রকাশ পাইতেছিল না, প্রশ্নপৃষ্ট হইয়া এবার অবসাদ জড়তাগ্রস্ত স্বরে বলিল, "কি?"

"এই স্বর্গভোগের খাতিরে সরোজবাবু উপার্জ্জন চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন, নয়? কিন্তু অতগুলি কাচ্চা বাচ্চা খাবে কি? স্বর্গের মুরুব্বি কি বলেন?"

বিমলার কন্যা অনূঢ়া ষোড়শী চপলা সেই সময় ঘরে ঢুকিয়া তীব্র বিরক্তির সহিত বলিল, "মা, বাবা ডাক্‌ছেন, শীগ্‌গীর যাও বাপু।"

হাঁ করিয়া খানিক চাহিয়া থাকিয়া বিমলা আলস্য জড়তাচ্ছন্নের মত বলিল, "কেন রে?"

মেয়েটি অধিকতর বিরক্তির সহিত বলিল, "জানি নে বাপু। ঘুম থেকে উঠে কোথা বেরিয়েছিলেন, সস্তাদামে মাংস কিনে নিয়ে বাড়ী এলেন। বল্লেন এখুনি সাঁৎলে রাখ্‌তে হবে।"

"তুই যা-না মা। উনুনে দুখানা কাঠ ঘুঁটে দিয়ে—"

"যা, তোমার বজ্জাত ছেলে মেয়ে। ওদের সাম্‌লাব, না মাংস সাঁৎলাব?"

"দিগে যা না ওর কাছে। একটু আটকে রাখুক।"

"ফের শুয়ে পড়েছেন। ছেলে দিতে গেলে এখুনি খিঁচিয়ে উঠবেন। তুমি চল না, ও সব সেলাই ফেলাই রাখ। জান ত বাবা কেমন মানুষ। তোমার ওসব সখ কেন বাপু? এস শীগ্রী।"

মেয়ে প্রস্থান করিল। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেলাইগুলা গুটাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "চললুম বড়দি, আমার কিছু কি স্থির হয়ে কর্‌বার যো আছে?"

বিমলা প্রস্থান করিল। দীপ্তি স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন কথা বলিল না।

বড়দি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থেকে সরোজের মতি গতি দিন দিন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিজের উপার্জ্জন চেষ্টা নেই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখ্‌তে দেবে না, স্ত্রীকে সেলাই ফোঁড়াই করে দু পয়সা আন্‌তে দেবে না। কেবল দেনা করে খোলাম কুচির মত

পয়সা ওড়াতে চায়। বাড়ীর ইট কাঠ কখানা বেচে এবার যে কদিন চলে চল্‌বে। তারপর বিমলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে কোথা দাঁড়াবে, কি খাবে জানি না।

দীপ্তি বলিল, "প্রবল সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারী। শুধু নাবালক আর বিধবা নয়, বিমলাদির মত সধবাদের অবস্থাও মন্দ দেখছি নে। দৌর্ব্বল্য ক্লান্ত দেহে, গজেন্দ্র গমনে বেশ চলেছে!"

বড়দি বলিলেন, "হাঁ, বেশ চলেছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন, আলস্য আরাম-প্রিয়, যথেচ্ছাচারী, স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব যন্ত্রণা কতখানি, বিমলার কাছে জেনে নিস্। এ সব দেখে শুনে, তোরা যে বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিস্ তাতে আশ্চর্য্য হই নে।"

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। নীরবে ভাবিতে লাগিল।

বড়দি খানিক গড়াগড় দিয়া উঠিয়া বসিলেন। সেলাইয়ের কলটা মেঝেয় নামাইয়া কাটা কাপড়চোপড়গুলা গুছাইয়া লইয়া সেলাই করিতে করিতে বলিলেন, "দীপ্তি, তুই বি, এ পাশ করে তারপর এম, এ পড়বি?"

দীপ্তি অন্য মনে বলিল, "সুবিধা পাই ত পড়ব?"

"তারপর কি কর্‌বি?"

"আত্ম গঠন।"

"তার মানে?"

"ওই গীতায় যাকে বলে অভ্যাস যোগ, তাই। কিন্তু এখন ভাবনায় পড়েছি, সরোজবাবুর স্বভাব সংশোধনের জন্যে কি করা যায়? দাদির সঙ্গে আর খানিক পরামর্শ কর্‌তে হবে।"

"বিয়ে টিয়ে কর্‌বি না?"

"কেন কর্‌ব না? তবে সরোজবাবুর মত দায়িত্ববোধহীন কুঁড়ের বাদশাকে নয়, সরকারমশাইয়ের মত অসৎ পথে উপার্জ্জন উৎসাহী অসাধু

পুরুষকে নয়। আমি বিয়ে কর্‌ব এমন সুস্থ সচ্চরিত্র লোককে, যাঁর মগজে ভাব্‌বার ক্ষমতা আছে, হৃদয়ে বোঝবার ক্ষমতা আছে, কব্জিতে খেটে খাবার ক্ষমতা আছে।"

বাহির হইতে দাদামণির বুড়া ভৃত্য নিতাই ডাক দিল, "দীপ্তি মা এখানে আছেন?"

দীপ্তি বলিল, "হাঁ, কেন?"

"কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

"সেখানে আর কে আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "সরকারমশাই।"

দীপ্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জুতা পায়ে দিতে দিতে বলিল, "জয় মঙ্গলময়। শুভস্য শীঘ্রং। আসি এখন বড়দি ; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সব বাধা বিঘ্ন জয় করে সত্যের পথে চল্‌তে পারি। ছোট কায ছোট হোক, তবু সে ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য। তার খাতির রাখা চাই।"

তারপর একটু হাসিয়া বলিল, "কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা আইবুড়ো আর বিপত্নীক প্রেম-পিপাসুর প্রণয়ের দরখাস্ত শুনে শুনে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে উঠার চেয়ে, এম্নি সব ছোট খাট কাযের ভিতর দিয়ে নিজের চরিত্র-গঠনে মন দেওয়া ঢের ভাল, কি বলুন?"

বড়দি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ করি, ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি কথায় সরকারমশায়ের সুমতি উদ্বোধন ক'রে বিপদগ্রস্তার উপকার হোক্‌। আর একটু আশীর্ব্বাদ, শ্রীভগবানে মতি থাক।"

দীপ্তি সেইখান হইতে ভূমে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম জানাইয়া শশব্যস্তে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বড়দি পূজার আসনে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন।

দীপ্তি আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "পায়ের ধুলো দিন বড়দি, আপনার আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সরকারমশায়ের সুমতি উদ্বোধন করা হয়েছে। আর একটা সুখবর, সদুপায়ে খেটে খাবার মত তাঁর একটা চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছি।"

বড়দি বলিলেন, "শুভ, শুভ, তাঁর ভ্রাতৃবধূদের ন্যায্য প্রাপ্য ?"

দীপ্তি বলিল, "খুশী হয়ে মিটিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তাঁদের এখানে আন্‌বার জন্যে লোক পাঠানো হোল। আমাদের সামনেই সব মিটমাট হবে।"

বড়দি সানন্দে বলিলেন, "একেই ত বলে সুশিক্ষা। সৎকার্য্যে যত্নশীল, উৎসাহ উদ্যম তৎপর না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ। ওরে তোরা বেঁচে থাক, ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"

বজ্র-ঝঙ্কার

১

জমিদারসাহেবের প্রকাণ্ড বাসভবনের সদর অন্দর জনকোলাহলে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে পূর্ণ।

অন্তঃপুরের শেষ প্রান্তে একটা—পৃথক নির্জ্জন খণ্ড। খণ্ডটার বাহিরের দিকে সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। বারেণ্ডা, উঠান ঘর সমস্ত আলোকহীন। কেবল শেষ প্রান্তে এক বৃহৎ সসজ্জ ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। ঘরের মাঝখানে আসনে বসিয়া, হেট হইয়া এক সুন্দরী নারী কি একখানা শাস্ত্রগ্রন্থ নীরবে পাঠ করিতেছে। চারিদিক—নিস্তব্ধ। বাহিরের কোলাহল মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণভাবে—বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিতেছে। আবার অলক্ষ্যে বায়ুস্তরেই মিলাইয়া যাইতেছে! সুন্দরী—পাঠমগ্ন।

আলো হাতে এক বাঁদী নিঃশব্দ পদে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। তরুণীর লক্ষ্য নাই। বাঁদী কাশিয়া ডাকিল, "হজরৎ—"

তরুণী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। কুর্নিশ করিয়া বাঁদী বলিল, "দামাদমিঞা আসছেন।"

"কে?"

"দামাদমিঞা!"

"হজরৎ মাপ করুন, ফকিরসাহেব।"

"আস্‌তে বল।" তরুণী পাঠ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। মৃদু পরিহাসের হাসি, অলক্ষ্যে অধর প্রান্তে চমকিয়া অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল। দাসী বারেণ্ডায় আলো রাখিয়া চলিয়া গেল।

২

একটু পরে, এক সুন্দরকান্তি যুবক—ফকির আসিয়া বারেণ্ডায় উঠিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর; কিন্তু মুখমণ্ডল দুশ্চিন্তা আঁধারে—ক্লান্তি মলিন। চঞ্চল দৃষ্টিতে বারেণ্ডার চারিদিক চাহিয়া তিনি একবার দাঁড়াইলেন। তারপর স্খলিত-চরণে ঘরে ঢুকিলেন। অস্থির কণ্ঠে ডাকিলেন, "আমিরাণ"

তরুণী আসনের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্য ফকিরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, নতশিরে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। চোখ বুজিয়া, ক্ষণিকের জন্য মনে মনে কি যেন গোপনে ভাবিয়া লইল।

মুহূর্ত্তে শরাহত মৃগের মতই—ফকিরসাহেব লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। বারেণ্ডার পাশে, পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "এ ধৃষ্টতা-অত্যাচার সহ্য হয় না। এমন কর তো—আর আস্‌ব না।"

তরুণী হাসিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, "খুসী তোমার! ঘরে এস, আপাততঃ। যখন এসেইছ।"

ফকির ফিরিলেন। দুয়ারের কাছে আসিয়া পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন।

তরুণী ক্ষণিকের জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া, নিজের আসনে বসিয়া পাঠ্যের উপর আবার দৃষ্টি স্থির করিল!

ফকির চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। একটু থামিয়া সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন, এ রকম উত্ত্যক্ত কর?"

তরুণী পাঠ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, স্থিরস্বরে উত্তর দিল, "তুমি নিজেই নিজেকে উত্যক্ত করছ। আমি করি নি।"

"তুমি কর নি?" রুক্ষ কণ্ঠে ফকির বলিলেন, "কেন তুমি আমায় অভিবাদন কর? কি অধিকার তোমার? তোমার অভিবাদন আমি গ্রহণ করব কেন? এ সব লৌকিকতার অর্থ কি?"

তরুণী দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি লোক সমাজের কেউ নই। লৌকিকতার অর্থও আমি বুঝি না। তবে নিজের মঙ্গল আমার প্রার্থনীয়—এই পর্য্যন্ত। তোমার উদ্দেশ্যে মানসিক—অভিবাদন নিবেদনে—"

বাধা দিয়া ফকির বলিলেন, "ওতে আমার কোন উপকার নাই।"

"তোমার না থাকতে পারে। আমার আছে।"

"কিন্তু আমার তাতে সর্ব্বনাশ!"

তরুণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলিয়া ফকিরের মুখের দিকে চাহিল। ফকিরের চঞ্চল দৃষ্টি—অজ্ঞাতেই নত হইল।

তরুণী পাঠ্যের দিকে চোখ ফিরাইয়া শান্তস্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি বিবাদ প্রার্থী নই। আমি নিজের জন্য যে মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমার জন্য সেই মঙ্গল আমার প্রার্থনীয়।"

"তোমার প্রার্থিত মঙ্গলে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার জন্য কোন মঙ্গল কামনা করো না—কোন দরকার নেই তার। তুমি আমার মঙ্গল একেবারেই চেও না।"

তরুণী কথা কহিল না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "তাই—হবে।"

ফকির ঘরে ঢুকিলেন। তরুণী চোখ না তুলিয়াই বলিল, "ওইখানেই আসন আছে। বস?"

ফকির চাহিয়া দেখিলেন দ্বারের পাশে কম্বল বিছানো আছে। বসিলেন। দুজনেই নীরব।

৩

কিছুক্ষণ পরে ফকির হঠাৎ ডাকিলেন—"আমিরাণ—"

তরুণী অতিমাত্রায় চমকিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে ফকিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিল না।

একটু সঙ্কুচিত হইয়া ফকির বলিলেন, "অত চমকে উঠলে ?"

"আমার বাইরের নামটা সময় সময় আমার কানে বড্ড আঘাত দ্যায়। কি বলছো ?"

"কিছু না। পড় তুমি।" ফকির অন্তদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। অন্তমনস্কভাবে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

তরুণী আশ্চর্য্যভাবে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। তারপর আবার পাঠ সুরু করিল।

"শোন"—ফকির কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আবার ডাকিলেন! তৃষিত-চঞ্চল দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটা কথা বল্‌তে চাই।"

তরুণী মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া—পরক্ষণেই আহতভাবে দৃষ্টি নামাইল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "বল।"

কি বলিতে উদ্যত হইয়া ফকির হঠাৎ থামিলেন। সজোরে বলিলেন, "না, থাক্ সে কথা।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী সংক্ষেপেই বলিল, "থাক।" সে আবার পড়িতে লাগিল।

একটু নীরব থাকিয়া ফকির বলিলেন, "তোমার কিছু বলবার আছে ?"

"কি সম্বন্ধে ?"

"যে কোন বিষয়ে।" একটু থামিয়া ফকির বলিলেন, "তোমার নিজের সম্বন্ধে ?"

তরুণী কছু না। শুধু আত্মোন্নতি লাভের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।"

নিচে "অন্য বিষয় ?" ফকিরের স্বর সঙ্কোচে জড়াইয়া গেল।

তরুণী চিন্তিত দৃষ্টিতে ফকিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "হয়ত কিছু বল্বার ছিল। কিন্তু সেটা অনধিকার চর্চ্চা হবে। এতেই শুনছি—আমার ধৃষ্টতা অত্যাচারে তুমি অশান্তি-ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছ।"—সে হাসিল।

ফকিরের ঠোঁটে অপ্রস্তুত ক্ষীণ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মুহূর্ত্তে আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিলেন। পশ্চাদ্বদ্ধ হ'য়ে ঘরের মেঝে পায়চারী করিতে করিতে বলিলেন, "বল তোমার কি বল্বার আছে। আমি ফকির সে কথা সত্যি, কিন্তু আমি তোমার স্বামী—সে কথাও আমার মনে আছে।"

"সে কথা মনে রাখার উদ্দেশ্য ?"

"যদি তোমার কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়।"

"সাধু তুমি! ফকিরসাহেব কিন্তু এই সদুদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন মতলব মনে লুকানো নেই ত ?"

হঠাৎ কশাঘাত খাইয়া, তেজস্বী সিংহ যেন কেশর ফুলাইয়া দাঁড়াইল। মাথা তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে ফকির বলিলেন, "তুমি কি মনে কর আমায় ?"

প্রসন্নস্মিত মুখে তরুণী বলিল, "স্বামীত্বের অহঙ্কার জ্ঞান যখন মনে রেখেছ, বলছ—পত্নীর কর্ত্তব্য জ্ঞান আমারও কিছু রাখার দরকার। এটা অনধিকার চর্চ্চা হচ্ছে না ত ?"

"কি বলতে চাও তুমি ? আমি ভণ্ড তপস্বী ?

"সবটা নয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ! মার্জ্জনা কর।"

"অর্থাৎ ?"

"বাসনা ক্ষোভের হাত এড়িয়ে চলতে গিয়ে আবার জড়িয়ে পড়বার চেষ্টায় আছ। নয় কি? না—রাগারাগির কথা নয়। নিজেকে বুঝে ছাখো।"—স্বর অত্যন্ত শান্ত, অতি স্নেহময়।

ফকির স্তব্ধ। মাথা হেঁট করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিরুত্তরে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তরুণী নিরুদ্বিগ্ন ভাবে আবার পড়িতে লাগিল।

৪

অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া, ফকির নিঃশব্দে নিজের আসনে বসিলেন। ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "মন আমার উগ্র অশান্তি বিক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বড় উগ্র অশান্তি।"

তরুণী পড়িতে পড়িতেই বলিল, "উগ্র তপস্থায় তীব্র আঘাত লাগ্‌লে, সাধকের উগ্র অশান্তিই আসে।"

"আমি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছি। এ রকম করে আর ত পারি না।"

তরুণী নীরব। ফকির রুষ্টস্বরে বলিলেন, "মূর্খতা করেছি আমি। কুক্ষণে ঘরের পথে পা বাড়িয়েছিলুম। এই সাত বছরের পর—এদিকে না আসাই উচিত ছিল। ফকিরের পক্ষে বন জঙ্গলই ভাল।"

"হাঁ। নির্জ্জনে উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বিশ্রামপ্রদ।"

"গৃহ কোণে নির্জ্জনতা আছে কি?"

"আছে। যদি মনকে নির্জ্জন করে নিতে পারা যায়।" তরুণী নত শিরে পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিল।

ফকির স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তরুণী হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "কি দেখছ ফকির?"

"দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা! যদি স্ত্রী না হতে, তোমায় পূজা করতুম!" ফকিরের স্বর আর্দ্র, কোমল!

"উঃ! ঘাড়ে লাগে।" তরুণী হাতে মাথা রাখিয়া আড় হইয়া শুইল। স্মিতমুখে বলিল, "স্ত্রী হওয়ার অপরাধেই বুঝি—পদাঘাত করেছিলে?"

ফকির উত্তেজিত হয়ে বলিলেন, "পদাঘাত তোমায়? তোমায় পদাঘাত?"

"আমায় নয়। আমার লৌকিক সম্মানকে! রাগ হোল আমার আত্মীয়দের ওপর, তুমি শাস্তি দেবার জন্যে ত্যাগ করলে আমায়! কিন্তু পার নি সাহেব।' বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পার নি আমার! বরং উপকারই করেছ তাতে।"

তরুণী হাসি মুখে আবার পাঠ্যের দিকে চোখ দিল।

ফকির অপ্রসন্ন ভাবে ক্ষণেক নীরব রহিলেন। নিম্নস্বরে বলিলেন, "আমি আবার যদি গৃহী হতে চাই?"

ব্যঙ্গস্বরে উত্তর হইল, "সে কামনাও আছে না কি?"

"যদিই থাকে।" স্বরে, জেদ!

"গৃহ আছে?"

"সম্পূর্ণই আছে।"

"গৃহিণী?"

"সশরীরে সামনে বিদ্যমান।"

"ফকিরি মিথ্যা হয়ে গেল ফকিরসাহেব! নিজকে ভণ্ডামি দিয়ে ঠকালে? সর্ব্বত্যাগের ব্রত নিয়েছিলে—শুধু ভিক্ষার জন্য? ভুল! ভয়ানক ভুল করছ!" তরুণী সংযত, স্মিতহাস্যে ফকিরের দিকে চাহিল।

ফকির অস্বস্তি বোধ করিলেন। হাতে কপাল চাপিয়া চোখ আড়াল করিলেন। কুণ্ঠারুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "কেন? সন্তান কামনায় আমার অধিকার নাই কি?"

"কি, কি? তরুণী হঠাৎ সোজা হইয়া বসিল। দু হাতের দৃঢ় বেষ্টনে সবলে নিজের বক্ষ ছাঁদিয়া—তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "সন্তান কামনা? দেহ-জাত না কি?"

ফকির সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না।

তরুণী সপরিহাসে বলিল, "কি জবাব ফকিরসাহেব? সত্যটা শুনতে পাই না?"

ফকির 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন! চোখের হাত সরাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "যদি তাই হয়।"

"দেহ-জাত সন্তান কামনা?"

"আপত্তি কি?"

"শুভ! কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার দৌহিত্রী পৌত্রী একটাও নাই। থাকলে সন্তান কামনাশীল যোগীর হাতে আজই সম্প্রদান করতুম।" হাসি-মুখে সে পাঠ্যের দিকে দৃষ্টি দিল।

"যোগী!"—ফকির কশাহতের মত চমকিয়া উঠিলেন। বিবর্ণ মুখে ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তোমায় একদিন বিবাহ করেছিলুম, নয়? তুমি আমার স্ত্রী নয়?"

"সে প্রশ্ন আজ কেন?"

"প্রয়োজন, তুমি গৃহে বাস কর্‌ছ নয়?"

"কি পাপ! আমার ব্যক্তিগত সংবাদ এ তত্ত্বের মাঝে আসে কেন? ফকিরসাহেব, সাধুসঙ্গে সদালোচনাই শ্রেয়ঃ। দেহের আর গৃহের সংবাদে যোগীর প্রয়োজন কি?"

"অদম্য আকর্ষণ!"—ফকির উৎক্ষিপ্ত চিত্তে লাফাইয়া উঠিলেন। পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে ঘরের মেঝেয় আবার পায়চারি করিতে লাগিলেন।

"যা অদম্য, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়াই, পুরুষকার-উপাসক যোগীর স্বধর্ম্ম।"—তরুণী সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ফকির থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "নারী তুমি। গৃহ কোণেই বরাবর আবদ্ধ, নয়?"

গম্ভীরভাবে তরুণী বলিলেন, "খুব সসজ্জ গৃহখানাই দেখ্‌ছ, না? সত্য সত্যই শ্বশুরবাড়ী এসেছ তাহলে?"

"আমায় অপমান করছ?" ফকির উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

"তুমি নিজের সাধনাকে অপমান কর্‌ছ ফকিরসাহেব। উচ্চ সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে, ইতর—কামনার দিকে দৃষ্টিপাত—ও যে নিজের সর্ব্বনাশ!"

"তোমার বুদ্ধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। সাপুড়ের সাপ খেলা দেখ্‌ছ?" ফকির গর্ব্বিত দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"দেখেছি। সাপের বিষদাঁত যদি ভাঙা হয়ে থাকে, তবে খেলা মন্দ নয়। খেল্‌তে চাও তো সাপের দাঁত ভাঙো।"

অস্থির ভাবে ফকির বলিলেন, "স্পষ্ট করে বল, কি বল্‌ছ?"—ফকির এক পা অগ্রসর হইয়া, আবার পিছাইলেন।

"বল্‌ছি হাত দুটো পেছ্‌মোড়া করে বেঁধে রেখে—অনর্থক অশান্তি পীড়ন ভোগ কর্‌ছ কেন? ও বাঁধন খুলে ফেল।"

ফকির সে কথায় মনোযোগ দিলেন না। অধীরভাবে বলিলেন, "তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। কেতাব ছাড়। ওতেই তুমি অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছ। এক কথায় অন্য জবাব দিচ্ছ। তোমার কথা বুঝছি না।"

পুস্তক বন্ধ হইল। গম্ভীরভাবে তরুণী বলিল, "ফকিরসাহেব, রাত বাড়ছে। আস্তানায় যাও।"

ফকির চমকিয়া উঠিলেন। অন্যমনস্কভাবে—দুহাতে নিজের রুক্ষ-বিশৃঙ্খল দীর্ঘ কেশপাশ মুঠাইয়া ধরিয়া—অতিশয় উন্মনাভাবে বলিলেন, "কেন?"

"আসন ছেড়ে, বৃথা তর্ক-কোলাহলে বাইরে ঘুরে বেড়ানো ফকিরের ধর্ম্ম নয়। মন্ত্রবিদ্ তুমি, মন তোমার কোন পথে চল্‌ছে লক্ষ্য কর। মশাল হাতে করে স্বর্গের পথ হারিও না।"—তরুণী পুস্তক হাতে করিয়া আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। আসনত্যাগে উদ্যত হইয়া বলিল, "নিজের আস্তানায় যাও।"

ফকির সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মোহোন্মাদনা-বিহ্বল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অস্ফুট জড়িত স্বরে বলিলেন, "স্বর্গ? কোথায় সে?"

তরুণী স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া আবার আসনে বসিল। পুস্তক খুলিয়া আবার নীরবে পড়িতে লাগিল।

ফকির অস্থির কণ্ঠে ডাকিলেন,—"আমিরাণ—"

সংযত স্বরে উত্তর হইল, "ভণ্ডামির শেষ পরিণাম কি গুণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হবে? তোমার সাধনার প্রাণশক্তি যা—সে মাথায় রাখবার জিনিস। সাধু তুমি—তাকে পায়ের তলায় বিসর্জ্জন দিও না।"

অধীর চরণে কিছুক্ষণ ঘরের মেঝেয় পায়চারি করিয়া সহসা ক্লান্তভাবে ফকির সাম্‌নে আসিয়া ধূলার উপর বসিলেন। অধিকতর জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বিদ্রূপ অতি সুন্দর? অতি সুন্দর আমিরান্? কিন্তু তোমার গাম্ভীর্য্য—অতি ভীষণ ভয়াবহ! যে বীণা মধুর সাহানা গাইতে পারে, সে উদগ্র দীপকে কেন পুড়িয়ে মারে?"

ঘাড় তুলিয়া তরুণী কঠিন কণ্ঠে বলিল, "বারুদের কারখানায় আগুন লাগালে কি হয় জানো?"

"জানি। একটা উদ্দাম সুন্দর আগুনের খেলা দেখে—আনন্দ পাওয়া যায়।"

"সে আনন্দের পরিণাম?"

"তৃপ্তি।"

"না। ভস্ম? শুধু ভস্মস্তূপ?" তরুণী আবার পড়িতে লাগিল।

উত্তেজিত কণ্ঠে ফকির বলিলেন, "হোক্ ভস্ম! হোক্ ভস্মস্তূপ! আমি তাই চাই। দোহাই তোমার নমাজের আসন ছাড়।"

দৃঢ় স্বরে উত্তর হইল, "না, আমার সাধনার জমাট ভাব আমি ধ্বংস কর্‌তে পারব না। ফকিরসাহেব, আবার বল্‌ছি—মশাল হাতে করে স্বর্গের পথ হারিও না।"

"তোমার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি। রসনা সংযত কর। অহঙ্কৃতা নারি! তোমার স্পর্দ্ধাকে দণ্ড দেবার অধিকার আমার আছে, জান? আমি তোমার স্বামী!"

তরুণী ঈষৎ হাসিল। কোন কথা বলিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—জানি।"

"পত্নীর কর্ত্তব্যজ্ঞান স্মরণ কর।"

তরুণী মুখ তুলিয়া বলিল, "যারা ঢাক বাজায়, তারা কানের পর্দ্দা ছিঁড়ে ফেলে! নিজেরা কানে কম শোনে। পত্নীর কর্ত্তব্য—স্বামীকে ধ্বংসের পথে যাবার সুযোগ দেওয়া নয়। ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। ফকিরসাহেব আবার বল্‌ছি, আমি প্রতিযোগিতা প্রার্থিনী নয়—সহযোগিতা দ্বারা তোমার সাধন-জীবনের উন্নতি প্রার্থিনী। নিজেকে মূর্খতা থেকে বাঁচাও।"

রূঢ় স্বরে উত্তর হইল, "বাঁচাচ্ছি। তুমি আসন ছাড়। নচেৎ—" ফকির থামিলেন।

"নচেৎ ?" তরুণী প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

"নচেৎ তোমার আসনের সম্মান আমি রাখ্‌ব না।"—একটু থামিয়া শ্লেষ মিশ্রিত রুক্ষ স্বরে ফকির বলিলেন, "গৃহীর আবার আসন! ফেলে দাও আসন! মূর্খ নারী তুমি। এই চার দেয়ালের মধ্যে তুমি চিরদিন আবদ্ধ আছ। তুমি আসন প্রাণায়ামের অর্থ কি বুঝবে? তোমার পক্ষে গৃহীর কর্ত্তব্যপালনই শ্রেয়ঃ।"

স্মিতমুখে তরুণী বলিল, "বৃথা বিতণ্ডায়—বৃথা শক্তিক্ষয়। অনন্ত মত—অনন্ত পথ। উদ্দেশ্য—সিদ্ধি লাভের দিকে অগ্রসর হওয়া। মত, পথ নিয়ে কলহের প্রয়োজন কি? যে পথ যার ধাতে সয়, সেই পথে তাকে চল্‌তে দাও। তুমি—"

বাধা দিয়া ফকির বলিলেন, "আমি তাই দিতে চাই। তুমি যখন গৃহী তখন গৃহীর কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য।"

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চ হাসি হাসিয়া সবিদ্রূপে তরুণী বলিল, "তাই না কি? আমি গৃহী আমি গৃহিণী!" দৃপ্ত বিদ্যুল্লতার মত তীব্র হাসির ঝিলিক্ হানিয়া মুহূর্তে সে সোজা হইয়া বসিল। প্রশান্ত—স্থিরোজ্জ্বল দৃষ্টি ফকিরের মুখের উপর স্থাপন করিয়া, দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "ফকিরসাহেব, শেষ পর্য্যন্ত সকল দিকেই ভণ্ডামি সুরু কর্‌লে! নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে নিয়ে আর পার্‌লে না—এবার আমার কর্ত্তব্যকে—বিচার, শাসনের কোঠায় বন্দী কর্‌তে এসেছ? যার মন—গৃহ এবং দেহের মমতা অতিক্রম করে চলে গেছে, তাকে দেখছ গৃহী! দেহী! ভুল, ভুল ফকির-সাহেব! আমি বাইরের দিকে গৃহে বাস করছি, কিন্তু—অন্তরে আমার গৃহ নাই! দেহ আমার সসজ্জ, কিন্তু মন আমার দেহে আবদ্ধ নাই! চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী দেখছ কোন নারীকে? ফকিরসাহেব, তুমি ভাল গৃহত্যাগী সেজেছ, চমৎকার! তুমি বাইরে গৃহত্যাগ

করেছ, কিন্তু অন্তরে তোমার গৃহ বিদ্যমান! তোমার ত্যাগ কই সাহেব?"

হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের ঝাপ্টা খাইয়া ফকিরের দৃষ্টি যেন অন্ধ হইয়া গেল! উচ্চহাসি, সুতীব্র বচন—ফকির শুনিলেন—বিশ্ব কম্পনকারী বজ্র-ঝঙ্কার!—ফকিরের কানে তালা ধরিল! ইন্দ্রিয়গ্রাম নিস্পন্দ স্তব্ধ হইল।

তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। শান্ত নম্র কণ্ঠে বলিল, "ভণ্ডামির পরিণাম ভণ্ডামিতে দাঁড় করাতে উদ্যত হয়েছিলে, তোমার মোহকে আঘাত করে চললুম তাই! অপরাধ নিও না আমার। ফকিরসাহেব, যোগীর স্নায়ু, আর ভোগীর স্নায়ু এক নয়। ভোগীর আচার, যোগীকে মৃত্যুদণ্ড দান করে। একই মেঘে বৃষ্টি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সত্য। কিন্তু দুই-ই স্বতন্ত্র ধর্ম্মশীল! বিদ্যুৎ আকাশে চমকে আকাশেই মিলিয়ে যায়, কিন্তু বৃষ্টির সাধ্য নাই আকাশে বাসা বাঁধে—তাই মাটীতে তার অধঃপতন! সামলাও ফকির! জ্ঞানী তুমি, সাধক—নিজেকে সংযত করবার শক্তি তোমার হাতের মুঠোয় আছেই। মুঠো খোল—শক্তির সদ্ব্যবহার কর। সার্থক হও। অলীক ভ্রান্তির পিছনে ছুট্‌ছ কোথায়?"

দুহাতে মুখ ঢাকিয়া, যন্ত্রণারুদ্ধ কাতর কণ্ঠে ফকির বলিলেন, "তোমায় পত্নী জ্ঞান করেই—"

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর হইল, "ভুল তোমার! পত্নী জ্ঞান করনি—প্রেতিনী জ্ঞান করেছিলে! কিন্তু আমি প্রেতিনী নয়, পত্নী-ই। তোমার প্রেমত্বলাভ আমার প্রার্থনীয় নয়। দেবত্বলাভই বাঞ্ছনীয়। পত্নীর দিক থেকে এই পর্য্যন্ত। কিন্তু লৌকিকতা জ্ঞানের সমস্ত স্তর অতিক্রম করে আরও উঁচুতে যখন যাই—তখন আমার সাধন পথের, সহস্র পথিকের মাঝে, তোমায় এক শ্রদ্ধাস্পদ সাধকরূপেই দেখেছি। স্বামীরূপে নয়। আমি—আর—স্বামী সেখানে হারিয়ে যায়! সব হারায়! এ

পথে চলতে এসে, তুমি পত্নী দেখ্‌ছ কাকে? নারী দেখ্‌ছ কোথায়? সন্তান কামনা কর্‌ছ কোন দেহে?"

"ক্ষমা কর। ভ্রান্ত আমি—অতিশয় ভ্রান্ত!"

শান্ত গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "আমার ক্ষমা—এই আঘাতে-ই! ফকির-সাহেব—দেহাত্মজ সন্তান—সাধক জীবনে সহনীয় নয়। সাধকের পক্ষে মানসাত্মজ সন্তান—সাধনার সিদ্ধি লাভ-ই শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ! এই নাও, আমার আসন ছেড়ে যাচ্ছি, বস। জাগাও তোমার আত্মার সমস্ত সুষুপ্ত সূক্ষ্ম, শক্তিকে। নিজেকে জয় কর্‌বার জন্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হও। খোদার আশীর্ব্বাদ তোমার জন্যে আস্‌বেই।"

তরুণী প্রস্থান করিল। মুহ্যমান ফকির ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন শূন্য আসনখানা যেন পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া—কোন এক পথচারী গায়ক সহসা উদাস করুণ কণ্ঠে খেয়ালি সুরে গাহিয়া উঠিল:

"আমি ত তোমার ঘুমান নলিনী
যোগিনী তোমার হৃদয়সাধা।
কিসের কারণে সেধেছ এসেছ
সাধিয়া মরমে দিতেছ ব্যথা।
গোলকের দ্বারে রসের সায়ারে
দুজনে সিনান করিব তথা—"

সবলে মাথা ঝাড়া দিয়া ফকির উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—আকাশের বিদ্যুৎ! তুমি আকাশে চমকিয়া, আকাশেই মিলাইয়া যাও। আর ওগো বজ্র-ঝঙ্কার! তুমি আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিয়া সমস্ত অনিষ্টকর অহঙ্কারের উচ্চশিরে ভাঙ্গিয়া পড়! ভাঙ্গিয়া পড়! পৃথিবীতে সত্যকার মঙ্গল আন! বিশ্ব চরাচর নির্ম্মল আনন্দে পূর্ণ কর!

শঠে শাঠ্যং

১

সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মনে পড়িল আজ হাতে কোন কাজকর্ম্মই নাই। ভাবিলাম আপদ চুকিয়াছে, সপ্তাহের ছয়টা দিন নিজের শ্রাদ্ধোৎসব লইয়া খাটিয়া মরি, আজ সে হাঙ্গামা নাই। বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া, খোস মেজাজে আজ দুনিয়ার খবরে মনোযোগ দেওয়া যাক।

কয়দিনের সঞ্চিত—দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের বোঝা টানিয়া লইয়া শয়ন করিলাম।

দেশ বিদেশের খবর শেষ করিয়া, শেষে নিজেদের খবরে আসিয়া পৌছিলাম। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থার সম্বন্ধে যত খবর—এবং যত নয়ানূতন বিধি-বিধান সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতেছে, তার সংবাদ! নয়ানূতন বিধি-বিধান বলিতেছি এই জন্য যে, প্রচলিত বিধি বন্ধনের যেখানটা কালের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাসন-কসন যেখানটায় ঢিলা হইয়া পড়িবার যো হইতেছে, সেখানে নূতন লাগাম কসিবার বন্দোবস্ত-উৎসব।

পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, উৎসবটা বেশ গুরুতর উৎসাহেই মাথা ঝাড়া দিয়াছে। বিশেষ করিয়া সমাজের সব চেয়ে বড় রকমের বেওয়ারিশ সম্পত্তি এই নারী সমস্যাটা লইয়া বেশ জাঁক জমকের মামলাই বাধিয়াছে। বেওয়ারিশ বলিতেছি এই জন্য যে—এ সমস্যাটার বিচারে

যার যেমন খুসী তিনি তেমনি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন—বাধা দিবার কেহ নাই। শুধু যাহাদের লইয়া এই সমস্যা, তাহাদের বিশেষ কিছু কর্ত্তৃত্বের অধিকার—এখানে নাই। যাক সে কথা। কেন না ও সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া সত্য কথা কিছু বলাই পাপ।

পড়িতে লাগিলাম,—নারীজাতির উন্নতির বিরুদ্ধে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু উন্নতিটার উপায় কি—গোল বাধিয়াছে তাহা লইয়া। একদলের মতে—যে ব্যবস্থা নারীজাতির উন্নতির অনুকূল পথ, অন্যদলের মতে সেই ব্যবস্থাটাই নারীজাতির অধঃপতনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। তাঁহাদের মতে, নারীজাতিটা প্রভু জগন্নাথের মত হস্তপদহীন অবস্থায় যেমন আছে—ঠিক তেমনিই থাক। উন্নতিটা আপনিই ভুঁইফোঁড় হইয়া উঠুক। উন্নতি প্রচেষ্টায় যদি কেহ হস্তপদের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন, তবে সেটা পবিত্রতা-বিরোধী, গর্হিত দুষ্কর্ম্ম! সে-হেন পাষণ্ডোচিত ধৃষ্টতা একান্তই অমার্জ্জনীয়! এবং এহেন অস্তিত্ব-প্রমাণ সচেষ্ট হাত পা গুলার ধৃষ্টতা দমনের জন্য ইঙ্কিকেপী চিকিৎসা প্রয়োগেই অবশ্য কর্ত্তব্য।

কথাগুলা শুনিতে বেশ ভাল, এবং এ ব্যবস্থা দ্বারা—সমস্যাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি খুব সহজেই হয়। প্রভু জগন্নাথের স্বারূপ্য লাভ—এমন ত কিছু দুর্ভাবনার কথা নয়। শ্রমকুণ্ঠাতুর, আলস্যচর্চ্চাপ্রিয় মেয়ে—শুধু মেয়েরা কেন পুরুষ মাত্রেই ত এরূপ স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন। সব মেয়ে সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তবে পার্থক্য এই—জগন্নাথ-দেহ দারুময়। কিন্তু ওই মেয়েগুলির দেহ রক্ত মাংসে গঠিত। জগন্নাথের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, নিদ্রা, বাস, বসন ইত্যাদি পার্থিব প্রয়োজনের অভাবে যন্ত্রণা-দুঃখ কিছু আছে কিনা জানা যায় না। কিন্তু ওই পরানুগ্রহ নির্ভরশীলা মেয়েদের অনেকের ভাগ্যেই যে সেটা আছে—এবং সেই অভাবের পীড়নে অনেক শোচনীয় হৃদয়

বিদারক দৃশ্যই যে ইহসংসারে ঘটিতে দেখা যায়—একথা ধ্রুব সত্য। জগন্নাথের জন্য একদা একটিমাত্র কালাপাহাড় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই রক্ত মাংসের দেহগুলাকে কেরোসিন সংকারে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অনেক কালাপাহাড়ী ব্যবস্থাই যে গৃহেগৃহে সুবিদ্যমান। তার প্রতিকার ত সোজাসুজি জগন্নাথ স্বারূপ্য লাভে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

খবরের কাগজের বধূ নির্য্যাতন ব্রতকথাগুলা না হয় অবজ্ঞার তুড়িতে উঠাইয়া দিলাম। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি যে, আমার ঐ প্রতিবেশীদের গৃহে—

কিন্তু যাক সে কথা। শত্রু বাড়াইয়া লাভ নাই। কুবুদ্ধি দোষে, একটা প্রাণঘাতী অন্যায়ের বিরুদ্ধে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম বলিয়া যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি সে ত জীবনে ভুলিবার নয়। কান মলিয়া শপথ করিয়াছি, যারা দুর্ব্বল, যারা অত্যাচার পীড়িত, —আর কখনও তাহাদের উপকার করিব না; অন্ততঃ সজ্ঞানে ত নয়ই!

পুরাতন কথা মনে পড়িতেই মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। খানিকটা হতবুদ্ধির মত বসিয়া ভাবিলাম। বাস্তবিক, এ দুনিয়াটা নির্জ্জলা জুলুমের রাজত্ব। এখানে যার জোর আছে,—মুল্লুকের মালিক হইবার অধিকার, মাত্র—তারই।

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আবার পড়ায় মন দিলাম। একটা নূতন লেখা চোখে ঠেকিল। নারীজাতির নিরুপায় অত্যাচার পীড়িত অবস্থার সংস্কার-প্রয়াসিনী, একজন মহিলা লেখিকার উদ্দেশে জঘন্য শ্লেষ বর্ষণ করিয়া প্রবন্ধটি রচিত। খুব উপাদেয় প্রবন্ধ সন্দেহ নাই! বিদ্বেষান্ধ ইৎরামোর সৌরভে মন মোহিত হইয়া গেল!

সমস্ত প্রবন্ধটি পড়া শেষ করিয়া নীচে নাম স্বাক্ষর দেখিলাম "সুনীলা দেবী!"

নূতন নাম! কে ইনি? যাঁহার উদ্দেশে এই ঈর্ষাপঙ্ক ছিটান হইয়াছে, তাঁহাকে যে কার্যোপলক্ষ্যে আমিও চিনি! বেশ জানি, তিনি এ পঙ্ক-উৎসব অভিষেকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কেন না দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া—আমার সেই একবারের লাঞ্ছনার মত বহু লাঞ্ছনাই তিনি অম্লানবদনে বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন। আর বহু অত্যাচারকেই বহুবার আঘাত করিয়াছেন—সুতরাং বহু অত্যাচারীকেই নিজের শত্রু করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব এ অভিনন্দন তাঁহার একান্ত উপযুক্ত, আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই!

কিন্তু এই একান্ত করুণাময়ী পরম কল্যাণীয়া সুনীলা দেবীটি কে! প্রবন্ধটা আবার আগাগোড়া পড়িতে লাগিলাম। বা! বা! সমস্তই যে পরিচিত কণ্ঠের বাণী বলিয়া মনে হইতেছে! এই ঈর্ষান্ধ ক্রূর-কুটিল খলতা কোথায় যে শুনিয়াছি কোথায় যে দেখিয়াছি।

কিন্তু সে কোথায়?

২

চাকর আসিয়া খবর দিল, ভৈরববাবু দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

বলিলাম, "এখানে নিয়ে এস।"

ভৈরববাবু আমার প্রতিবেশী। তিনি শিক্ষিত—তথা বড়দরের চাকুরে ভদ্রলোক। অতএব আমরা কলম-পেশা কেরাণীর দল তাঁহাকে খাতির করি।

ভৈরববাবু স্বভাবতঃ খুব নিরীহ ভদ্রলোক। চালচলন পল্লীগ্রামের ন্যাকা-মেয়ে-সুলভ। সোজা কথায় মেয়েলি ন্যাকামি পূর্ণ। প্রাণপণ চেষ্টায় মেয়েলি ধরণের মিহি সুরের বোল, সেই ধরণের চেষ্টা-বিকৃত—অদ্ভুত সাইজের হুঁ হুঁ হাসি, বক্র কুটিল কটাক্ষ—পায়ে পায়ে জড়াইয়া

গোপিনীদের যমুনা-গমন ধরণের চলন, সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্! অবশ্য আমি এ সকল রুচি বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই না। ভৈরববাবুর বন্ধুরা ওই ব্যাপারটা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন এবং এই অধম বৃদ্ধের উপর অনুযোগের শর বর্ষণ করিয়া বলিতেন, "দাদা, কেরাণীর নকলনবিশী করে চুল পাকালে, কিন্তু এমন মধুরতম ন্যাকামির নকলনবিশী কিছুই আয়ত্ত করতে পারলে না ?"

কি জবাব দিতাম বলিয়া কাজ নাই। তবে নিজের কৃতিত্ব হীনতায় আমি যে আদৌ ক্ষুব্ধ ছিলাম না, এটা ধ্রুব সত্য।

ভৈরববাবু ঘরে ঢুকিয়া স্বভাব সিদ্ধ বক্র কটাক্ষে একবার চারিদিক চাহিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া মিহিতম আওয়াজে বলিলেন, "কি হচ্ছে দাদা ?"

সংক্ষেপেই বলিলাম, "বিশ্ববার্ত্তা পড়্‌ছি ভায়া, বসুন।"

ভায়া বসিলেন। হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,"ও কাগজখানা আজকাল প্রথম শ্রেণীর কাগজ হয়ে পড়েছে। চমৎকার চলছে নয় ?"

অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভায়া একজন তৃতীয় শ্রেণীর বি-এ। সাহিত্যেও একজন মস্ত বড় বিদ্যা-ধুরন্ধর না, কি একটি চিজ্ বটে। তাঁহার অভিমত অবহেলা করিবার সাহস হইল না। একটু ইতস্তত করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "কেমন চলছে তা ঠিক জানি নে। কিন্তু মেয়েদের কথা নিয়ে এরা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা করে চল্‌ছে বলে মনে হয়।"

জানিতাম ভায়া প্রথম জীবনে আধুনিকতার উগ্র উপাসক ছিলেন। তারপর গুটিকতক দার পরিগ্রহ ও গুটিকতক সন্তান লাভের পর, আধুনিকতার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নিজের কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু পরের কন্যাদের বিবাহ করিয়া গৃহে আনিবার সময় তিনি পণপ্রথার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান।

তা ছাড়া দোল দুর্গোৎসবে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা স্ত্রীর ও সন্তানদের চিকিৎসা খরচ—ইত্যাদির ট্যাক্স তিনি শ্বশুরবর্গের শিরে যথা-অযথা নিয়মেই চাপাইয়া থাকেন। এ লইয়া পারিবারিক অশান্তি। বিবাদ মন-কসাকসি চলিতেও শুনিয়া থাকি। তথাচ তিনি—নিরীহ ভালমানুষ! অতএব অতি সাধু সজ্জন ব্যক্তি!

ভায়া আমার কথা শুনিয়া গুম্ হইয়া গেলেন। মনের ভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিবার পাত্র তিনি নন্। অত মন-খোলা হইলে নাকি ন্যাকামির মাধুর্য্য ও নিরীহত্বের সৌকুমার্য্য টেকে না। অতএব তিনি অতি সৌখীন শ্রেণীর স্বল্প ভাষী! একটু নীরব থাকিয়া শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "কেন? সকলেই ত ঐ কাগজখানার খুব সুখ্যাতি করছে। কালকের কাগজে সুনীলা দেবীর একখানা প্রবন্ধ বেরিয়েছে সেটা পড়ে দেখুন দেখি। সকলেই বলছে কাগজখানা খুব উচ্চশ্রেণীর মূল্যবান দৈনিক পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বটে! সেই অমূল্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটির জন্য কাগজখানির মূল্য এত বাড়িয়াছে? চমৎকৃত চিত্তে একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হাঁ, সুনীলা দেবীর লেখা পড়েছি, ইনি কে বলুন দেখি?"

অস্বাভাবিক উৎসাহে ভায়ার মুখ হঠাৎ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সোৎসাহে তিনি বলিলেন, "কেমন পড়্‌লেন বলুন দেখি?'...কে' আচ্ছা জুতো দিয়েছে নয়? খাসা লিখেছে নয়?"

ভায়ার এতখানি আহ্লাদের কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এই নূতন লেখিকাটির পরিচয় জানেন?"

হুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া আধ আধ স্বরে ভায়া বলিলেন, "জানি বই কি। না জান্‌লে কি চলে? লেখাটা ফার্ষ্ট ক্লাস হয়েছে কি না বলুন?"

বলিলাম, "লেখিকা আপনার পরিচিতা? ও! তাহলে লেখাটা ফার্ষ্ট ক্লাস হওয়াই উচিত বই কি! বলুন ত উনি কে?"

ভায়া যেন কি একটা অপরিসীম গৌরবের আতিশয্যে এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া পরম তৃপ্তিকর হাসি হাসিলেন। তারপর পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিয়া মোলায়েম সুরে বলিলেন, "কাউকে বলবেন, না। আমার মেয়ে টেঁপির নাম সুনীলা দেবী।"

বিস্ময়ের আধিক্যে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম! বলিলাম, "টেঁপি! সে কি! তার বয়স ত মোটে আড়াই বছর! সে লিখলে কি করে? তা হলে এ লেখা—"

গোঁফে তা দিয়া, মুখ টিপিয়া হুঁ হুঁ করিয়া হাসিয়া ভৈরববাবু বলিলেন, "আমিই তার হয়ে লিখে দিয়েছি। মেয়েদের গালাগালি দিতে হলে মেয়েদের নামের আড়ালে আশ্রয় নেওয়াই নিরাপদ। নইলে পুরুষদের কেউ পাল্টা জবাব দিয়ে বসতে পারেন! বুঝলেন দাদা, এ হচ্ছে একটা বেষ্ট পলিসি!"

বাইরে দুই ঠোঁট একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। অন্তরের অন্তস্থলে দীর্ঘশ্বাসের সহিত ধ্বনিত হইল এতদূর কাপুরুষ!"

৩

দুয়ারের নিকট হইতে আমার ভাগিনেয় নিরুপম বলিল, "মামা, কালকের বিশ্ববার্তা কাগজখানা এখানে আছে?"

"আছে। কেন?"

"আমার বন্ধু অমূল্য ওই অফিসের ঠিকানাটা নেবে।"

ভৈরববাবু উৎসাহে চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "কেন কেন? ওদের অফিসের ঠিকানায় অমূল্যর কি দরকার?"

নিরুপম বিশ্ববার্ত্তা খানা তুলিয়া লইতে লইতে অন্যমনস্কভাবে বলিল, "অমূল্য কি একখানা প্রবন্ধ পাঠাবে বুঝি।"

ভৈরববাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবজ্ঞা ও শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, প্রবন্ধ পাঠাবে অমূল্য? অমূল্য আবার প্রবন্ধ লিখতে শিখেছে না কি? নিয়ে এস ত দেখি।"

নিরুপম বলিল, "সে প্যাকেট বন্ধ করে ফেলেছে।"

নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া ভৈরববাবু বলিলেন, হলেই বা! দেখে আবার বন্ধ করে দেব। ভাল হয় ত এক কলম সার্টিফিকেট লিখেও দিতে পারি, অবশ্য যদি বল। অমূল্যকে বল, ওদের অফিসে আমার মস্ত অথারিটি আছে।"

নিরুপম হতবুদ্ধি হইয়া গেল! ভৈরববাবু চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "ডাক, ডাক, অমূল্যকে এইখানেই ডাক।"

নিরুপম ভ্যাকাচাকা খাইয়া অগত্যা অমূল্যকে ডাক দিল। সতেজ অথচ প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি তরুণ অমূল্যচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। অমূল্য গরীবের ছেলে, টিউশনি করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়। খুব উৎসাহী কর্ম্মঠ প্রকৃতির ছেলে। সমাজ সংস্কারের চেষ্টায় ইতিমধ্যেই বার কয়েক লাঞ্ছনা কশাহত। বর্ত্তমানে সে কোনও বিখ্যাত কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে।

অমূল্য ঘরে ঢুকিতেই, ভৈরববাবু চিবাইয়া বলিলেন, "কি হে? তোমরাও সবাই "লিখিয়ে" হয়ে উঠ্‌লে? নরা হরা যে খুশী সেই আজকাল লিখছে! বাংলা সাহিত্যটার আর জাত রাখলে না দেখছি।"

নিরুপমের হাত হইতে বিশ্ববার্ত্তা খানা লইয়া অমূল্য ঠিকানা দেখিতে দেখিতে বলিল, "সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি।" তারপর পকেট হইতে একটা কাগজের প্যাকেট বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিল।

বিশ্ববার্ত্তার ঠিকানার দিকে চোখ রাখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে ঠিকানা লিখিতে লাগিল।

ভৈরববাবু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি! তা বলে যে সে লিখবে? বা! তালে আমি একজন বি-এ, গ্র্যাজুয়েট— সরস্বতীর বরপুত্র, আমিও সাহিত্য চর্চ্চা করব, আমিও লিখব, আর ওই রাস্তার কয়লাওয়ালাটা—ও ও লিখুক! আর যে তোর জুতো সেলাই করে দেয়, সেই মুচিটাও লিখুক!

ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বলিল, "ক্ষমতা থাকলে লিখতে পারে বই কি? রাশিয়ার কাউন্ট টলষ্টয়—"

ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরববাবু তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "বৈদেশিক আদর্শ আমদানি—চাই না। আমাদের দেশের আদর্শের পক্ষে কোনটা স্বাস্থ্যকর, সেটা বিচার কর। এই যে আমাদের দেশের মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়্‌ছে, এটা কি ভাল হচ্ছে? না—এই যে তারা সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা কর্‌তে আস্‌ছে, এইটে উচিত হচ্ছে?"

অমূল্য প্যাকেটটি হাতে লইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "আস্‌ছি।"

ভৈরববাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিও বুড়ো মানুষ, আপনারও মাথার চুল পেকেছে। আপনি বলুন দেখি, মেয়েদের এই সব লেখা পড়া চর্চ্চা—এর ফল কতদূর খারাপ দাঁড়ায়? মেয়েদের নাম জাঁকান ভাল?"

আমি ঠোঁট-কাটা বুড়া, সুতরাং জিভ্‌ চুলকাইয়া উঠিল! ইচ্ছা হইল, পাণ্টা প্রশ্ন করি,—ভৈরববাবুর মনে যদি এতখানিই তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইয়াছে, তবে নিজের নিরপরাধ নিরক্ষর কচি মেয়েটির নামের উপর এমন ঘৃণ্য অত্যাচার করিলেন কেন? যাত্রাদলের পুরুষেরা গোঁফ কামাইয়া

বৃন্দাদূতী সাজে, রাধারাণী সাজে, মহারাণী মেথরাণী সাজে, মেয়েলি হাবভাব অনুকরণ করে, নাকি সুরে টানিয়া বুনিয়া কথা কয়—সেগুলা কৌতুকের খাতিরে না হয় সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ভৈরববাবুর মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের—এই সগুম্ফ—অবগুণ্ঠন-মণ্ডিত, পাড়া-কুঁদুলি বিন্দি-বাউরিণী জনোচিত নৃত্য এটা শোভনীয় মনে হইতেছে না। যথেষ্টই শোচনীয় বোধ হইতেছে।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সত্য কথা বলাই পাপ। বলিতে গেলে কথাগুলাও অত্যন্ত রূঢ়-কর্কশ শোনায়। তাছাড়া স্ত্রী কন্যা লইয়া আমাকেও সমাজে বাস করিতে হইতেছে। ভৈরববাবুর ফরমাস মত আদর্শ স্ত্রীচার্যের ন্যাকামিতে তাহারা হয়ত পরিপক্ক না-ও হইতে পারে, এবং সেই ত্রুটির জন্য তাহাদের আগাগোড়া বেতপেটা করিয়া, কেরোসিন ঢালিয়া পুড়াইয়া মারিবার সৎসাহস সম্ভবতঃ আমার নাই। অতএব এতগুলা দুর্বলতা স্কন্ধে থাকিতে ভৈরববাবুর মত প্রচণ্ড-পৌরুষ প্রতাপশীল—ক্রূর ভৈরবকে ভয় করাই উচিত! সুতরাং নিরুত্তর রহিলাম।

৪

অমূল্য শূন্য হস্তে ঘরে ঢুকিল। বলিল, "আপনি কি বলছিলেন মেয়েরা স্কুল কলেজে আর সাহিত্যে অনধিকার চর্চ্চা করছেন?"

ভৈরববাবু নিদারুণ শোকাহত হইলেন। অনেকগুলা পদ্য আওড়াইয়া বিস্তর গদ্য প্রয়োগ করিয়া, তিনি এক লম্বা শোকোচ্ছ্বাস উদ্গার করিলেন। তার মোট অর্থ, মেয়েদের বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ। সত্যযুগে ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীরা কেহ কেহ সে পাপটা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেটা সত্যযুগ বলিয়া—পাপটা ক্ষমার্হ। এ কলিযুগে সে স্পর্দ্ধা একান্তই অসহনীয়।

অমূল্য কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। খুব গম্ভীরভাবে বলিল, "সম্ভব।"

"শুধু সম্ভব? একান্তই—" ভৈরববাবুর নাকি সুর অধিকতর তীক্ষ্ণ সানুনাসিক হইয়া উঠিল। পৃথিবীর সমস্ত ক্লেদ নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার উপর বর্ষণ করিতে করিতে তিনি শোকাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা আর সমাজের সর্ব্বনাশ করা, —একই কথা। অবশ্য একটু আধটু বাংলা শেখা মন্দ নয়, কিন্তু নাটক নবেল বা অন্য কিছু তাদের হাতে ছোঁওয়া মোটে উচিত নয়। ভাল ভাল কবিতার বই পড়া তাদের একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা এতই বেড়ে উঠেছে, যে এসব তারা পছন্দই করেন না! অধঃপতনের বাকী কি?"

মনে পড়িল ভৈরববাবু কতকগুলি কবিতার বই ছাপাইয়াছেন, কিন্তু —যাক সে কথা। তাঁহার উৎসাহ প্রশংসনীয় এই কথাই বলা ভাল। কিন্তু তাঁহার বোধশক্তির অনুপম সূক্ষ্মতা—তাঁহার সযত্ন অভ্যস্ত নাকি-সুরের তীক্ষ্ণতারই অনুরূপ! দম্ভ, আত্মম্ভরিতা, এবং পরকুৎসাময়ী, শ্লেষ, ঈর্ষাকে যতই শানাইয়া চকচকে করা যাক, ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। তাঁহার মূল্যবান কবিত্ব প্রতিভা জন সমাজে আদৃত না হওয়ায়, তিনি একদিকে যেমন অপরিসীম ক্ষোভে আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চ্চার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পাপিষ্ঠাদের প্রভাব দোষেই তাঁহার প্রতিভা মাথা তুলিয়া দশদিক উজ্জ্বল করিতে পারিল না এবং তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য জয়মাল্যটা,ইহারাই জুয়াচুরি করিয়া আত্মসাৎ করিল!

সুতরাং ভৈরববাবুর মনোবেদনার অর্থ বুঝিলাম। মেয়েদের সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করিবার বিল পাশ হইল দেখিয়া—অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও স্বস্তিবোধ করিলাম। কঞ্জুস কৃপণের হাত হইতে সিকি মুঠা

ক্ষুদ ভিক্ষা পাওয়াও ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর পক্ষে পরম লাভ! বাংলাদেশের লাঞ্ছিতা-মাতৃশক্তি ভৈরববাবুর মত মহাপুরুষের দয়াশক্তির এই দমকা খরচে—আশা করি কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

ভৈরববাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে অমূল্য গম্ভীরভাবে বলিল, "স্বীকার কর্‌ছি, মেয়েরা কবিত্ব-মাধুর্য্য উপলব্ধি করেন না—অন্ততঃ আপনার কবিত্ব মহিমায় যে অভিভূত হয়ে পড়েন নি, এটা তাঁদের ঘোরতর ধৃষ্টতা! এ অপরাধের জন্য তাঁদের সাইবেরিয়ার মত কোন একটা স্থানে নির্ব্বাসন দেওয়া উচিত—এটাও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু—"

বাধা দিয়া রুষ্টস্বরে ভৈরববাবু বলিলেন, "ভাখো অমূল্য, তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী শিক্ষালাভ করেছি—"

অমূল্য বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। শিক্ষায় আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর, সেজন্য আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু বুদ্ধি—বোঝবার ক্ষমতা, কাণ্ডজ্ঞান—সেগুলো আলাদা জিনিস। অন্ধ বিদ্বেষভরে, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, মিথ্যা কুৎসা গ্লানি প্রচার কর্‌লে, সেটা অন্ধ ভক্তিভরে স্বীকার করি—এতটা সততা আমার মধ্যে নাই।"

ভৈরববাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া নাকি সুরে বলিলেন, "বুদ্ধিটা তোমাদেরই খুব বেশী! তোমাদের এই সব আস্কারাতেই মেয়েরা অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখছে! তোমাদের জন্যেই তারা উচ্ছন্নে যাচ্ছে! মেয়েদের অবস্থা যারা বোঝে, সেই সব বিজ্ঞ লোকরা কি বলে জান? ভাখো দেখি এই সুনীলা দেবীর লেখা পড়ে—ইনি একজন দস্তুর মত শিক্ষিতা মেয়ে, ইনি মেয়েদের স্পর্দ্ধার সম্বন্ধে কি বলছেন, পড় দেখি!"

অমূল্য বলিল, "পড়েছি, এবং এঁর প্রবন্ধ আমাদের কতকগুলা নূতন চিন্তার খোরাকও দিয়েছে। ইনি শিক্ষিতা হোন, চাই না হোন, কিছু এসে যায় না। ক্রুর সর্প মণির দ্বারা ভূষিত হলেও—ক্রুরতায় ভয়ঙ্কর!

ইনি যতই মোলায়েম নাকি সুরে ন্যাকামি প্রকাশের চেষ্টা করুন, এঁর নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতার ভেতর দিয়ে কেবল এঁর নীচাশয়তা ছাড়া কোন মহত্বই প্রকাশ পায় নি। যাঁর উদ্দেশে এই নীচ আক্রমণ চলেছে, তাঁকে আমি—আপনাদের চেয়েও ভাল জানি। জানি, ভণ্ডামিকে যে আঘাত করে, তার ওপর ভণ্ডের দল খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে! কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, —এই নতুন সুনীলা দেবীটি অত ভণ্ডামিতে পরিপক্ব হলেন কি করে?"

ভৈরববাবুর সযত্ন-অভ্যস্ত নাকি সুর অকস্মাৎ বীভৎস শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল! ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ছোটলোক! অত্যন্ত ছোটলোক! তোমার আজ থেকে কাল নেই, তুমি কোন্ সাহসে এত চম্বুক্টি কর্‌ছ? তুমি জানো, এই সুনীলা দেবী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে, বয়সে তোমার চেয়ে ঢের বড়! 'ইনি একজন এম-এ পাশ মেয়ে মানুষ!"

অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল! উঠিয়া দাঁড়াইয়া যোড়হাতে বলিলাম, "ভৈরববাবু অনেকগুলোই মিথ্যে বললেন! আর নয়, মাপ করুন এবার! আপনার এই এম্-এ পাশ সুনীলা দেবী পুরুষ মানুষ না হতে পারেন, কিন্তু ইনি যে মেয়ে মানুষ নন, সেটা আপনি ভালই জানেন। কেন আর আপনার পোষাকের বাহারের মর্য্যাদাটা নষ্ট কর্‌ছেন? অনুগ্রহ করে বাড়ী যান। এ ডাকা-হাঁকা বজ্জাতের পাল্লায়, 'মিটমিটে ডান্ ছেলে খাবার রাক্ষসদের' বেশী কিছু সুবিধার আশা নেই। আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করুন।"

ভৈরববাবু মুখ গোঁজ করিয়া উঠিলেন। অমূল্যের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "কই দেখি · তোমার সেই প্রবন্ধটা। একবার পড়ে ফেরৎ দেব।"

অমূল্য সংক্ষেপে বলিল, "সেটা ডাকে ফেলে দিতে পাঠিয়েছি। আসছে সংখ্যার বিশ্ববার্ত্তায় সেটা দেখতে পাবেন।"

ভৈরববাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কি সম্বন্ধে সেটা লিখেছ? রাজনীতি?"

অমূল্য বলিল, "আজ্ঞে না। সাধারণ মনুষ্য-নীতি সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। আপনার পরিচিতা—ওই মাননীয়া সুনীলা দেবী অনেকগুলি নূতন কথা ভাববার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁরি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু—"

বিস্ময়ে—এবং সম্ভবতঃ অন্য কোন অব্যক্ত কারণে—ভৈরববাবুর মুখ হঠাৎ—হাঁ হইয়া গেল! অমূল্যের কথায় বাধা দিয়া বিপুল ব্যগ্রতাভরে তিনি বলিলেন, "তাঁরি প্রবন্ধ সম্বন্ধে? তাঁর সম্বন্ধে?···কি···কি লিখেছ তুমি?"

অমূল্য বলিল, "কপিত্ব বিকাশক ন্যাকামি প্রকাশের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে, এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষ ছেড়ে তাঁকে মনুষ্য জনোচিত কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রেখে চলতে অনুরোধ করেছি। অপরের শক্তি-মত্তায় হিংসা করে, তিনি নিজে যে সকলের অশ্রদ্ধেয় হচ্ছেন, সে কথাটা তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের এলেকায় আসে নি—বন্ধুভাবে তাই একটু সৎপরামর্শও দিয়েছি।"

ভৈরববাবুর চোখ দুটি অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল!

তার পর কি হইল, সে কথা আর কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা নাই।

কোন রোগ?

সাধারণ অবিবেচক মানুষ মাত্রেরই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে। তাহারা যার কাছে এতটুকু উপকার পায়, তার কাছেই এতখানি বেশী উপকার পাইবার দাবী করিয়া বসে। এ জুলুম যে তাহাদের পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত নয়, নিজেদের অসমর্থতার গ্লানি মোচনের উদ্যম ও সাধনাই যে তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, এ কথা আলস্য-বিলাসী, পরনির্ভর-শীলতা-প্রিয় মানুষরা বুঝিতে চায় না। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বৃথা আত্মাভিমানবশে তাঁহারা যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করে, তাহাই চরম সত্য। অর্থাৎ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভিক্ষা পাওয়াই তাহাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত, ভিক্ষাদাতার অসামর্থ্য অনিচ্ছা, বিরক্তি বা বিরুদ্ধাচরণ, তাহাদের কাছে বিস্ময় ক্ষোভ ও নিরাকার অদৃষ্টদোষ মাত্র।

দেশের পুলিশের সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মনোভাব যে অনেকটা এই রকম হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা লইয়া সেদিন আলোচনা চলিতেছিল।

সিংহবাবুদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে একটা শুভ-বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি আত্মীয়-কুটুম্ব সমবেত হইয়াছিলেন। গতকল্য বিবাহ চুকিয়াছে, আগামী কল্য পাকস্পর্শ। পাকস্পর্শের আয়োজন বিরাট; সন্ধ্যার পর বর্ষিয়সী মহিলারা একতলার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া পরদিনের জন্য তরকারী কুটিতেছিলেন। কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালক ও যুবক আত্মীয়, ছাদের অন্যপ্রান্তে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন। সদর বাটীতে কর্ত্তাব্যক্তিদের সভা বসিয়াছে। তে-তলার ছাদে নববধূকে

লইয়া অল্প বয়স্কারা আনন্দ করিতেছেন, সুতরাং এই দলটি আর কোথাও মনোমত আশ্রয় না পাইয়া এইখানে আসিয়া জুটিয়াছে।

গ্রীষ্মকাল, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মিট্ মিট্ করিয়া তারাগুলি জ্বলিতেছিল। একটা গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া ছাদের মাঝখানে রাখিয়া তার চারিদিকে ঘেরিয়া পাঁচ সাতখানা বঁটি পাতিয়া বসিয়া, মেয়েরা কুটনা কুটিতে কুটিতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন।

ছেলেরা দূরে বসিয়া রাজনীতি ও দেশ বিদেশের নানা কথা আলোচনা করিতেছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে এদেশী ও বিদেশী পুলিশের কার্য্য পদ্ধতির ধারা সম্বন্ধে তুলনা মূলক সমালোচনা আরম্ভ হইল।

ভারত সম্রাটের খাস রাজধানী লণ্ডন সহরে সামান্ত কনেষ্টবলী বিগ্যায় সুশিক্ষাদানের জন্য কি সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে—কি চমৎকার প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া তাহাদের নির্ভীক, সত্যসন্ধ, সূক্ষ্ম-ন্যায়পরায়ণ, এমন কি আইনজ্ঞ ও সদ্যঃ আহতের চিকিৎসা ব্যাপারেও অভিজ্ঞ করিয়া তোলা হয়—তাহাদের সভ্যতা ভব্যতা কতদূর মার্জ্জিত রুচি সঙ্গত ও উন্নত করা হয়, একটি নবীন উকীল তাহারই বর্ণনা করিতেছিলেন।

সে দেশের কনেষ্টবলদের চরিত্র গঠনের জন্য এবং মনুষ্যোচিত কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জনের জন্য সে দেশে কত যত্ন লওয়া হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ শুনিতে শুনিতে বালক বিহারীলাল ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আর আমাদের দেশের পুলিশের কর্ত্তারা? এঁরা শুধু তিনটি গুণ দেখে—যত রাজ্যের গুণ্ডাকে পুলিশের কনেষ্টবলীতে ঢোকান একটি গুণ, সে মনুষ্যত্বহীন, 'পাহাড়ে' বজ্জাত কি না? দ্বিতীয় গুণটি সে সাফাই হাতে ঘুস নিয়ে, উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাতে জানেন ক না? তিন দফার গুণ, সে বিনা প্রমাণে সন্দেহমাত্রেই

নিরপরাধ ভদ্রলোকের ছেলের গলায় হাত দিতে পারে কি না! এই তিনটি গুণ থাকলেই ব্যস্ কেল্লা মার দিয়া!"

বিহারীর বয়স বছর চৌদ্দ, সে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাহারা কলিকাতায় থাকে। কলিকাতার প্রহরীদের সে নাকি ভালরকমই চেনে।

বিহারী যখন কথা বলিতেছিল, তখন ডাক্তারী বিদ্যালয়ের ছাত্র মোহনলাল তার চশমা জোড়ার ভিতর হইতে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, বিহারীর করুণ ভাবোদ্দীপক মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। বিহারীর নিগূঢ় মর্ম্মব্যথার কারণটা মোহনের জানা ছিল। হঠাৎ সে সরিয়া আসিয়া বাঁ হাতে বিহারীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কর্কশ স্বরে খোট্টাই টানে বলিল, "এই খোঁখা—ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল্' কিনিয়েসিস্?"

বিহারীকে কে যেন জলবিছুটি মারিল! মুহূর্ত্তে ভীষণ বিক্রমে ছট্‌ফট্ করিয়া, মোহনের বাহু-বন্ধন হইতে নিজের কণ্ঠ মুক্ত করিয়া সক্ষোভে বলিল, "আঃ, ছাড় মোহনদা, কি ফক্কুড়ি করো? যাও!"

মোহন মজলিসে সমাগত সকলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা ওকে জিজ্ঞাসা করুন—'ক্যা টাকা দিয়ে সাল্ কিনিয়েসিস্ কথাটার মানে কি?"

বিহারী সক্রোধে বলিল, "হ্যাঁঃ! জিগেস্ করবেন! করুন না, আমি চল্‌লুম!"

সে সলম্ফে স্থান ত্যাগে উদ্যত হইল। সকলে তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মনঃক্ষোভ দূর করিবার সময়োচিত সান্ত্বনা দিয়া সকলে মোহনের অন্যায় স্বীকার করিলেন। ছোটদের ক্ষেপাইয়া মজা দেখা, মোহনের একটা পুরাতন ব্যাধি বলিয়া, এক বর্ষিয়সী আত্মীয়া তিরস্কারও করিলেন। মোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু পুলিস কনেষ্টবলদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার কথা স্বীকার করতে ওর লজ্জাই বা

কেন ? ওঃ বেচারীর সেই শীতের রাত্রের—সেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত খুনী আসামীর মত মুখের ভাবটা—আমার আজও মনে পড়ে! মোষ্ট প্যাথেটিক্ সিন্!"

বিহারীর ক্ষোভের উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে একজন বলিলেন, "ব্যাপারটা কি হয়েছিল হ্যা মোহন ?"

মোহন বলিল, "গেল বছর শীত কালের কথা। বোধ হয় ডিসেম্বর মাস হবে। ওর স্কুলের এগজামিনের তাড়া পড়েছে, অনেক রাত অবধি জেগে রোজ পড়াশুনো করছে। একদিন রাত সাড়ে দশটার সময় পড়তে পড়তে হঠাৎ ওর কি একটা পাঠ্য পুস্তকের দরকার হয়। বইখানা ওর এক প্রতিবেশী ক্লাসফ্রেণ্ড চেয়ে নিয়ে গেছ্ল, বিকেলে ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল বুঝি—কিন্তু দেয় নি।"

—"বন্ধুর বাড়ী ওদের বাসার খান পাঁচ ছয় বাড়ীর পর, একটা গলির মধ্যে। এগজামিনের পড়াটা তখুনি ঠিক করে রাখবে, মনস্থ করে —বিহারী সেই রাত্রেই বইখানা আন্‌তে বন্ধুর বাড়ী গেল।"

—"তাড়াতাড়ির জন্যে ভুলেই যাক্, কিম্বা কাছেই বন্ধুর বাড়ী ভেবে হোক, ও বেচারী জুতো না পরে—খালি পায়েই গেছ্ল। গায়ে কোট খুলে রেখেছিল, শুধু গেঞ্জীর ওপরে সবুজ রংয়ের একটা র‍্যাপার ছিল।"

—"বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখলে, বৈঠকখানার দুয়ার বন্ধ। জানালা খোলা ছিল, ভিতরে আলো জল্‌ছিল। যদি ঘরে কেউ থাকে, তার কাছে বইখানা চাইবে—ভেবে, ও বেচারী বৈঠকখানার বারাণ্ডায় উঠে, জানালা দিয়ে উঁকি দিলে। দেখলে, ঘরে কেউ নেই। ও ভাবলে বন্ধুটি বোধ হয় তার অভিভাবকদের সঙ্গে আহারের জন্যে অন্তঃপুরে গেছে। অতএব এ সময় তাঁদের ডাকাডাকি করে, বইয়ের জন্যে বিরক্ত করাটা ভদ্রতা নয়। ফিরে যাওয়াই ভাল।

নিঃশব্দে ফিরল। গলির মোড়ে এসে দেখে একজন খোট্টা কনেষ্টবল ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে, এক মনে এক ধ্যানে খৈনি মর্দ্দনে নিবিষ্ট। সে এতক্ষণ ওর ওপর গোয়েন্দার দৃষ্টি পেতেছিল, কার সাধ্য তা বিশ্বাস করে! বিহারী কাছাকাছি হতেই কনেষ্টবলটা হঠাৎ এগিয়ে এসে বিনা দ্বিধায় হাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল!

বিহারী চমকে উঠল! মেজাজ কেমন তিরিক্ষে দেখছেনই ত! বিরক্তির মাথায় দাঁত খিঁচিয়ে, একটা অনাবশ্যক দীর্ঘ ঈকার যোগ দিয়ে প্রশ্ন করলে, "কী?"

কনেষ্টবল পরম গম্ভীর চালে, ওর র‍্যাপারটা দেখিয়ে মুরুব্বিয়ানা স্বরে বললে, "এই খোঁকা—এ সাল্ কোথা পেলি?"

হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে এবং এই অপমানসূচক প্রশ্নে অত্যন্ত চটে-মটে, ও ফস্ করে জবাব দিলে, "কেন? আমি কিনেছি!"

অভিভাবকদের বাদ দিয়ে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে নাবালকের নিজের কর্তৃত্ব জাহির করাটা কনেষ্টবলী আইনে বোধ হয়, ওর বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গেল। কনেষ্টবলটি ব্যঙ্গ স্বরে বললে, "ক্যা টাকা দিয়ে 'সাল্' কিনিয়েসিস্?"

মূল্যের অঙ্কটা ওর জানা ছিল না, এবং তখন বোধ হয় ওর চেতনা হোল যে ক্রয় ব্যাপারের ও যখন বিন্দু বিসর্গও জানে না, তখন সে দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে টেনে নেওয়া সুবুদ্ধি হয় নি! ওর নিজের কথাটা ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বুঝে—বিহারীর মাথা বিগড়ে গেল—

বিহারী সজোরে প্রতিবাদ করিল, "মাথা বিগড়ে গেল? কক্ষণো নয়! আমি এমন 'ভয় তরাসে' নয়?"

মোহন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহলে বোধ হয় সাহসের দাপটেই, মহা-মহিমার্ণব শ্রীমান্ বিহারীলাল কিঞ্চিৎ আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।"

বিহারী অধিকতর জোরে বলিল, "আত্মহারা ? কিছুতেই নয় ! আমি—"

মোহন বলিল, "I beg your pardon ! তা হলে—আত্মবিস্মৃত ! যেহেতু পাহারাওলাটা যখন পুনশ্চ রসিকতা করে বললে, "সাল্ কিনিয়েসিস্, না 'চোরি' করিয়েসিস্ ? ওই বাড়িমে কি 'চোরি' করতে গিয়েছিলি ?" তখন স্তম্ভিত বীরপুরুষ নিজের চৌর্য্যবিদ্যার অপটুত্বের প্রমাণ স্বরূপ ক্ষীণকণ্ঠে শুধু জবাব দিলেন, "আমি চোর নয়। আমি বাবুদের বাড়ীর ছেলে।"

বিহারী ক্ষোভ-কাতর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু হতভাগা মেড়ো কি তা বিশ্বাস করে ?"

নবীন উকীল বলিলেন, "ততটা আশা করা উচিত নয়। কারণ তারা পুলিশের নিম্নশ্রেণীর প্রহরী মাত্র। লোকের মুখ দেখে চরিত্র অনুমান করা তাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু তুমি যে সত্যিই 'বাবুদের বাড়ীর ছেলে' সেটা প্রমাণ করবার জন্যে তোমার বন্ধুর বাড়ীর ভদ্রলোকদের ডাকলে না কেন ?"

অধৈর্য্য হইয়া বিহারী বলিল, "ডাকব কি ? তাঁরাও পাহারাওলার কথা শুনে যদি আমায় সন্দেহ করতেন ? তা হ'লে ?"

সকলে হাসিলেন। মোহন কপট সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তা হ'লেই ত বেচারাকে সত্য জেলে যেতে হোত ! বিহারী আত্মবিস্মৃত নয়, আত্মজ্ঞানী পুরুষ !"

নবীন উকীল বলিলেন, "তারপর ?"

মোহন বলিল, "তারপর বুদ্ধিমান বিহারী ও ততোধিক বুদ্ধিমান খোট্টা বাবাজীর মধ্যে আইন জ্ঞানের গবেষণা সুরু হোল। আইনের সূক্ষ্ম জটিল রহস্য ভেদে দু'জনেরই কাণ্ডজ্ঞান সমান ; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত সমস্যাটার কি যে নিষ্পত্তি হোল, কেউ বুঝলে না।

পাহারাওলাটি বোধ হয় ভেবে চিন্তে দেখলে, সে সরকারের নিমকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যথোচিত মাত্রায় দুর্ব্বৃত্ত দমন করেছে, রাজ্যে আর চোর ডাকাতের ভয় নেই—সুতরাং ভদ্রদস্তুর প্রথায় কোনরকম সম্ভাষণ না করেই সে গম্ভীরভাবে প্রস্থান করলে। কিন্তু পাহারাওলার স্নেহালিঙ্গন থেকে মুক্তিলাভ করে যখন ঘরের ছেলেটি ঘরে ফিরলেন, তখন অবস্থা শোচনীয়! ঠিক যেন ছ' মাসের ম্যালেরিয়া জীর্ণ কাহিল রোগী!"

বিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ত্যাখো মোহনদা, বাড়াবাড়ি ক'র না বলছি।"

মোহন বিনয়-নম্র-কণ্ঠে বলিল, "সে ইচ্ছা থাকলে বলতাম ধনুষ্টঙ্কারের রোগী! তা কি বলেছি? বরঞ্চ এখন—" বলিয়া বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, সে সস্মিতমুখে বিহারীর দিকে অর্থসূচক কটাক্ষে চাহিল!

বিহারী নবোদ্যমে পুনশ্চ হাত পা ছুঁড়িয়া কি একটা তুমুলকাণ্ড বাধাই-বার উদ্যোগ করিতেছিল। মোহনের বচন গরিমায় ও নয়ন ভঙ্গিমায় দমিয়া গেল! নিরুদ্ধ ক্রোধে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া—ঘাড় গুঁজিয়া রহিল!

নবীন উকীল একটু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারের চোখ—শকুনির চোখই বটে! কিছুই এড়াবার যো নেই!"

আর একজন বলিলেন, "ডায়োগ্নোসিসের জন্য ধন্যবাদ!"

অপর একজন বলিলেন, "রোগ বিকার, সুতরাং নিরাময় প্রয়োজন!"

বিহারী অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, দেখিয়া নবীন উকীল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "forg·t and forgive, কিন্তু পাহারাওলা মশাই ছোট ছেলের সঙ্গে ও রকম রসিকতা করলে কেন?"

তাঁহাদের অদূরে—ছাদের শেষ প্রান্তে কতকগুলা দেবদারু কাঠের খালি প্যাকিং বাক্স জমা হইয়াছিল। তার অন্তরাল হইতে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন—ন-মাসিমা। সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ওটা বোধ হয় ওদের স্বধর্ম্ম। ওদের প্রভুভক্তি যথেষ্ট। কিন্তু যখন কাজ পায় না, তখন নিষ্কর্ম্মা অবস্থায়, কতকগুলো অকর্ম্ম যোগাড় করে ভুলক্রমে বাধিয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে ওরা ব্যস্ত হয়। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদের স্বভাব দেখেছি—দেশী ঝি-চাকররা কাজ ফাঁকি দিয়ে গল্প করতে আর ঘুমুতে মজবুত; কিন্তু অধিকাংশ বেহারী ঝি-চাকর দরোয়ানরা সে পাত্রই নয়! কাজে তারা 'আলে' না। কিন্তু কাজ না পেলেই অকাজে দস্যি-বৃত্তি করে বেড়াবে। তা সে খামকা কাউকে সেলাম বাজানই হোক, বা খামকা কারুর মাথা ফাটানই হোক—একটা কিছু ওদের চাই-ই!"

ন-মাসিমা এত নিকটে ছিলেন! খোশ গল্পকারীরা সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা কারণে ন-মাসিমার ব্যক্তিত্ব মহিমা সকলেই একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন।

ন-মাসিমা আবাল্য-বিধবা। ধর্ম্মচর্চ্চা, জ্ঞানচর্চ্চা এবং কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার সহিত সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন। এখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌছিয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে সমীহ করে। যেহেতু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাকি রীতিমত প্রখর।

মোহন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আ রে! আপনি এখানে আহ্নিক করতে বসেছিলেন! আমরা ত জানতুম না—"

আহ্নিকের আসনটা ঝাড়িয়া তুলিয়া গঙ্গাজলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "ভেবেছিলাম তোমাদের জান্‌তে দেব না, নিঃশব্দে সরে পড়ব। কিন্তু বিহারী বেচারীর ওপর তোমরা বড় অত্যাচার করেছ—"

বিহারী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "বলুন ত আপনি! এরা যেন আমায় 'কি' পেয়েছে!"

ন-মাসিমা বলিলেন, "তাই দেখছি বাবা! ছেলেদের সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে!"

মুহূর্তে সকলে সমস্বরে বলিল, "আসুন—আসুন! বসুন এইখানে।"

তিনি বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা, এ গুলো আগে পূজার ঘরে রেখে আসি।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে থান-দুই বারকোশ এবং গামলায় ভিজানো কতকগুলা কিস্‌মিস্ বাদাম পেস্তা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে দুইটী বালিকা। তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কিস্‌মিস্ প্রভৃতি বাছিবে। আগামী কল্য যজ্ঞ। পোলাওয়ের উপকরণ আজই গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

ছেলেরা ততক্ষণে থান-চার কুশাসন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছে। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ কি! ঝগড়া করতে এসেছি। কথকতা করব না কি?"

মোহন সবিনয়ে বলিল, "আপনার ঝগড়া মানেই কর্ণমর্দ্দন কাহিনী! কান ত বাড়িয়েই রেখেছি মাসিমা—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "তা হ'লে নিরুত্তর হওয়াই ভাল।"

বিহারী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "তা হ'লে মোহনদা আমায় ফের জ্বালাবে ন-মাসিমা। আপনি ওকে একটু বকুন।"

মোহন বলিল, "আমিও ত তাই বলছি। হয় আমি পাহারাওলার গল্প বলি! বিহারী ধনুষ্টঙ্কার প্র্যাক্টিস করুক—নয় ন-মাসিমা—"

বিহারীর পুনশ্চ ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম দেখিয়া ন-মাসিমা বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলছি। কিন্তু এটা ধনুষ্টঙ্কার কি জলাতঙ্ক—তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রোগকে কি বলে, তোমরাই বিচার করো বাছা। বিহারী ত ছেলেমানুষ, ক'লকাতার পথে বেরিয়ে পাহারাওলার বজ্রমুষ্টির

ফাঁদে পড়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে পল্লীগ্রামে ঘরের কোণে বসে, একটা নিরেট মূর্খ অদ্ভুত স্ত্রীলোকের কবলে পড়ে যদি আমাকেও ত্যক্ত হ'তে হয়, তা হ'লে তোমরা কি বলবে ?"

মুহূর্তে সকলে স্তব্ধ! ক্ষণ পরে মোহন বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আপনাকে ? বলেন কি মাসিমা ?"

মাসিমা বলিলেন, "যথার্থই বলছি। বেশী দিন নয়। গত শ্রাবণ মাসের কথা। আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে ঝুলন বসেছে। অতিথিশালায় বিস্তর লোক আসা-যাওয়া করছে, গ্রাম সরগরম! ঠিক সেই সময় আমাদের হুজুগে ঝি মোহিনী ঠাকরুণ একদিন বৈকালে এসে খবর দিলে—'অ-দিদিমণি, একজন ভৈরবী এসেছেন। তাঁর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে হরিদ্বারে গিয়ে বাস করছেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সকলের কাছে ভিক্ষা করে রেলভাড়া যোগাড় করছেন। আপনার কাছেও কাল আসবেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন। সৎ কাজ—দান করলে নিজেরই পুণ্যি'...ইত্যাদি।"

দানের ক্ষেত্রে আমরা পাত্রাপাত্র বিচার করাটা অপরাধ বলেই মনে করি, সে তর্ক তুলিও না। কিন্তু পরিচয় শুনে মনে একটু কৌতূহল জাগল। স্ত্রী ভৈরবী, স্বামী সন্ন্যাসী হরিদ্বার-বাসী। ভৈরবী ঠাকরুণ স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করেছেন—এটা নিশ্চয়ই পুণ্য কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামী যদি হরিদ্বারে বাস করেন, তবে ভৈরবী-পত্নী বাস করেন কোথা ? প্রশ্নটা অতর্কিতে বাচনিক উচ্চারণ করলুম। মোহিনী জবাব দিলে—"ইনি কাশীতে থাকেন। কাশী থেকে এখানে এসেছেন, ভিক্ষে-শিক্ষে করে রেলভাড়া যোগাড় করবেন।"

মনে কেমন খট্‌কা লাগল। হরিদ্বার যাত্রাই যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি কাশী থেকে চারশো মাইল পিছু হেঁটে এখানে আসবেন কেন? মনে

হোল, মোহিনী ঠিক জানে না, আন্দাজেই সবজান্তা বিদ্যা জাহির করছে।

যাক। কথাটা সেদিনের মত সেইখানেই চাপা পড়ল। আমিও নিজের কাজকর্ম্মের তাড়ায় ভৈরবীর কথা ভুলে গেলুম।

তারপর—দিন পাঁচ-ছয় শরীর অসুস্থ হওয়ায় তেতলার ঘরটায় পড়ে রইলাম। বাইরে কোথা কি হচ্ছে তার খবর পেলুম না। সুস্থ হয়ে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নীচে গেছি, শুনলাম ওদিকের দালানে ঝিয়েদের আড্ডায় পাড়ার মেয়েরা জড় হয়ে মহা সোর-গোল জুড়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি?"

ক্ষান্তঠাকরুণ, শ্যামার মা, সবাই ভক্তি গদগদকণ্ঠে বললেন, "সেই ভৈরবীঠাকরুণ তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ক'দিন ধরে আনাগোনা করছেন, তাঁদের নানা রকম "ভাল ভাল" "আশ্চর্য্য" কথা শোনাচ্ছেন। সে সব অদ্ভুত কথা তাঁরা জন্মাবধি কখন শোনেন নি। ভৈরবীঠাকরুণটি সে পাত্রী নন। তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী। নিজের জীবনের যে অলৌকিক ধর্ম্মরহস্যময় ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন, তা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁকে সবাই যথেষ্ট পয়সা কড়ি দিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভাল ভাল কথাগুলা কি?"

কেউ তারা সদুত্তর দিতে পারলেন না। শ্যামার মা প্রশ্ন শুনে রাগ করে বললেন, "এ কি ডাল ভাত রান্নার কথা যে এক নিশ্বাসে গড় গড়িয়ে বলে দেব? আমরা শুনতে হয় শুনে গেছি। অত ভাল কথার মানে কি ছাই বুঝতে পারি, যে আপনাকে বল্‌ব?"

মনে একটু অনুতাপ হোল। আহা, এমন সাধুসঙ্গ আমার বরাতে জুটল না! এতভাল কথার একটাও আমি শুনতেপেলাম না। একেই বলে দুর্ভাগ্য!

কিন্তু সৌভাগ্যের সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়াবার সখ থাকলেও, সময় আমার নেই। কাজেই নিজের কাজে ডুব দিলাম। ভৈরবীর কথা আবার ভুলে গেলাম।

অসুস্থতার জন্যে ক'দিন দেবালয়ে যেতে পারিনি। সেদিন দুর্ম্মতি হ'ল, আরতি দর্শনের জন্যে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর বাড়ী গেলাম। সঙ্গে প্রতিবেশীরাও চল্‌লেন।

ঝুলন উৎসব, ঠাকুর বাড়ীতে সেদিন ভীষণ ভীড়। একপাশে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছি, শ্যামার মা আমার হাতে চাপ দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন, "ন-মাসিমা, ওই দেখুন। ওই সেই ভৈরবী মা"

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটার ঠিক সামনেই, অর্থাৎ নাট-মন্দিরের মাঝখানে এক লম্বা চেহারার প্রৌঢ়া মেয়েমানুষ, মাথার কাপড় খুলে, এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরণে সাধারণ লাল পাড় শাদা সাড়ী, গলায় একছড়া কাঁচের মালা। হাতে দু'গাছি শাঁখা। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মন্দ নয়। কিন্তু সে যাই হোক—সেখানে আর যাই থাক, যথার্থ ভজনানন্দী সাধুর মুখের দীপ্ত লাবণ্য-শ্রী কই?

আমার মন দমে গেল।

তার চোখের দিক চেয়ে আরও আশ্চর্য্য হলাম। দেখলাম, তিনি আরতি দর্শন করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে, পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে—তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছেন। সে অন্বেষণ গভীর মনোযোগ পূর্ণ!

দৃশ্যটা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। ভক্তি করবার ভরসাটা অনেক ক্রমে গেল। চোখ আর মন দুটোকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগলাম। তিনি যে কি করলেন না করলেন, আর দেখতে প্রবৃত্তি হোল না।

আরতি শেষ হবামাত্র প্রণাম করে দেবালয় থেকে সরে পড়লাম। পাছে তাঁর গুণমুগ্ধদের উৎপীড়নে সেই খানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়—সে ভয়টা ছিল।

পরদিন সকালে বিন্দি-ঝি জানালে, কাল সারারাত্রি তাদের সঙ্গে জেগে বসে ভৈরবী-মা ঠাকুর বাড়ীতে যাত্রা শুনেছেন!

শুনে ভাবনা হোল; হরিদ্বার যাবার রেল ভাড়া সংগ্রহ করা কি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়? সে উদ্দেশ্য যদি থাকত, তা'হলে কাশী থেকে রেলভাড়া করে, এই বর্ষার দিনে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে রাত জেগে যাত্রার রং তামাসা দেখার সাহস অন্ততঃ আমার ত থাকত না, এটা নিশ্চয়। বিশেষতঃ নাটমন্দিরে পুরুষদের ভীড়ের সামনে সেই যে বিসদৃশ ভঙ্গীর দাঁড়ানো, আর সেই যে অনুসন্ধান উৎসুক-দৃষ্টি, সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। বিন্দির সংবাদে মন আরও মুসড়ে গেল।

কিন্তু অনধিকার চর্চ্চাটা ভাল নয়। সুতরাং প্রকাশ্যে কাউকে কিছু বললাম না।

পরদিন বৈকালে কাপড় কাচতে যাব বলে নীচে নামছি, এমন সময় বিন্দি এসে জানালে "ভৈরবী-মা আপনার কাছে ভিক্ষা করবার জন্য আসছেন।"

ভিক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। তাঁকে আসতে বললাম। যদিও আমার সময় অল্প, তবুও তাঁর সত্য পরিচয়টা জানবার জন্য ইচ্ছা হোল। ঘরে এনে বসালাম একটা প্রণামও করলাম। দেখলাম প্রণাম গ্রহণের সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা নিজের পূর্ব্ব-জীবনের পরিচয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় অনিচ্ছুক।

কিন্তু এঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব-জীবনের বিস্তারিত পরিচয় বিবৃত করতে লাগলেন। সে বিবৃতি এত বেশী, যে সময়েরই অভাব স্মরণ করে, আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তাঁর ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর স্বামী নাকি পূর্ব্ববঙ্গে কোন জেলায় থাকতেন। স্বদেশী হাঙ্গামার সময়ে দেশের লোককে পীড়ন করতে অসম্মত হয়ে তিনি নাকি চাকরী ছেড়ে দেন। তারপর দেশের কল্যাণ কামনায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই অবস্থায় তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মবৃত্তান্তও এমনই অলৌকিক দৈব রহস্যপূর্ণ—যার বিবরণ নির্লজ্জ গুলিখোর বদমাইসের মুখেই শুধু শোভা পায়। কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের মুখে নয়!

বুঝলাম, কোন শ্রেণীর "ভাল ভাল" আশ্চর্য্য কথা শুনে মোহিনী, বিন্দি, শ্যামার মা'র দল শ্রদ্ধায় আত্মহারা হয়েছে! আমার কিন্তু হত-শ্রদ্ধায় মরতে ইচ্ছে হোল। আত্মসম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার ছেলে দুটির এখন বয়স কত?"

উত্তরে শুনলাম, "একজন বিশ বৎসরের, একজন চোদ্দ বৎসরের। বড় ছেলেটি একটি প্রকাণ্ড পালোয়ান, পশ্চিমের কোন রাজবাড়ীতে সে মোটর ড্রাইভার। ছোটটি প্রকাণ্ড সাধু, সে বাপের কাছে থেকে তপশ্চর্য্যা করে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—দেশোদ্ধার!"

শুনে মোহিত হব কি না ভাবতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটাও মনে উদয় হোল, যাঁর উপার্জ্জনশীল উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমান, তিনি কাশী থেকে রেলভাড়া খরচ করে বাংলাদেশে ভিক্ষা করতে এলেন কেন?

আমাকে স্তব্ধ অন্যমনস্ক দেখে তিনি কি ভাবলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে, গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ

করে চুপি চুপি এমন গুটি কতক কথা বল্লেন, যা তোমাদের মত উষ্ণ-মস্তিষ্ক ছেলেদের কাছে প্রকাশ করতে আমার সাহস নেই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ন-মাসিমা নীরব হইলেন। তাঁহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল, "পায়ে পড়ি ন-মাসিমা, আমরা কিছুতেই মাথা গরম করব না। আপনার কোন ভয় নেই, বলুন।"

নবীন উকিলটি বাধা দিয়া বলিলেন, "ন-মাসিমা ওদের বিশ্বাস করবেন না। তিনি কি বলেছেন, তা আমি আন্দাজেই বুঝতে পারছি। আর বোধহয় চেষ্টা করলে বলেও দিতে পারি, তিনি কোন দলের গুপ্তচর; গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবার জন্যে ওরা নিরপেক্ষ নিরীহ লোকদের অমি ভাবেই উত্যক্ত করে বেড়ায়। যাক, তাঁর কথাটা বাদ দিয়ে, তারপর কি হোল বলুন।"

ন-মাসীমা বলিলেন, "কচি কচি দুধের বাছাদের হিংসার মন্ত্র শিখিয়ে যারা উত্তেজিত করে বেড়ায়, তারা ভুল করে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করছে এ কথা আমি স্বীকার করি। দৈত্য-শক্তি—ক্ষাত্র ধর্ম্ম নয়, মনুষ্য-ধর্ম্মও নয়! রাজনীতির কোন তত্ত্বই আমি কস্মিনকালে বুঝি না, বরঞ্চ ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শটা কিছু কিছু বুঝি। যাক সে কথা। তাঁর কথাগুলো শুনে প্রথমটা মনে হোল, তিনি পাশ্চাত্যের আ[illegible]ী বিপ্লবপন্থী দলের মারণ মন্ত্র প্রচার করতে এসেছেন! অসৌজন্য হবে—জেনেও স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বল্লাম, আপনারা আত্মিক উন্নতি সাধনার পথ গ্রহণ করে সর্ব্বত্যাগী হয়েছেন। এসব রাজনৈতিক বিপ্লব-বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ চর্চ্চায় আপনাদের দরকার কি? এ গুলো যে সাধন পথের সর্ব্বনাশা প্রতিবন্ধক!

পাকা চোরেরা কি করে জানি না, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পৃথিবীর সংস্রবে বাস করছি। ভঁাড়ার ঘরে, আর ছাদে কুল-আচার, আম-আচার চুরি করবার সময় কাঁচা চোর গুলোকে অনেক বার ধ'রেছি! বামাল শুদ্ধ হঠাৎ গ্রেপ্তার হলে তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয়, তাও লক্ষ্য করেছি। আমার কথা শুনে, মুহূর্ত্তে তাঁর মুখেও সেই ভাব ফুটে উঠল। নিরতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তিনি বল্লেন, "হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে! এ সব আমাদের চর্চ্চা করা···এ সব চর্চ্চা ভাল-নয়, ভাল নয় বটে। এ সব চর্চ্চা কি ভাল? তা নয় বটে!"

অবস্থা কাহিল দেখে দয়া হোল, হাজার হোক ভগবানের জীব! মুহূর্ত্তে আমি সে কথা চাপা দিয়ে তাঁর সাধন ভজনের সংবাদ নিতে প্রবৃত্ত হলুম। তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। খুশীর আতিশয্যে সম্ভবতঃ আমাকে মোহিনী-ঝিরা শ্যামার মার সমশ্রেণীস্থ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন জীব স্থির করে, ভীষণ বিক্রমে আবার আত্মশ্লাঘা প্রচার সুরু করলেন। এ কথাগুলো তোমাদের বল্তে বাধা নেই। সুতরাং তিনি যেমন বলেছেন, আমি ঠিক অবিকল বলে যাচ্ছি। তোমরা শোনো।

জিজ্ঞাসা করলুম, "মোহিনী বলছিল আপনি ভৈরবী। আপনারা তান্ত্রিক?"

তিনি সা[illegible] ধন্য হৌক",

উপসংহারে তিনি পুনশ্চ—বিশেষ ভাবে স্মরণ করে[illegible]দিলেন—না"আমার শ্বশুরের নাম "ভগবানচন্দ্র" বলে, তাঁর নামে ঐ গান বাঁধা হয়!"

যেন তার শ্বশুরের নাম "ভগবানচন্দ্র" না হলে এ গান রচনাই হোত না?

বিহারী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "জোচ্চোর। একেবারে হস্তীমূর্খ!"

নবীন উকিলটি একটু হাসিয়া বলিলেন, "যাঁরা তাঁকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল, তাঁরা জন্ম জন্ম গোয়েন্দা পাঠান তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আপনাদের মত লোকের কাছে, মেয়েগোয়েন্দা পাঠাবার সময়, তাঁরা যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্না মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠাতেন, তাহলে তাঁদের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে একটু শ্রদ্ধা করতে পারতুম। যাক্, তারপর আপনি কি করবেন বলুন ?'

ন-মাসিমা বললেন, "অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ! যথার্থই কেউ তাঁকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার জন্য আমারও দুঃখ হোল। আর তাঁকে বেশী কথা বলবার সুযোগ দিলে নিজের ধৈর্য্য ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী বুঝে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। ভিক্ষার্থীকে রিক্ত হস্তে বিদায় দিতে নাই, তাই একটা নিকেলের আনি দিয়ে তাঁকে বললুম, এখন 'আসুন'। আর আমার সময় নেই।"

আমাদের মোহিনী ঝি, শ্যামার মা, এরা কেউ ছয় আনা, আট আনার কম তাঁকে "সৎকার্য্যে দান" করেন নি। কিন্তু আমার কাছে মাত্র এক আনা তিনি কেন পেলেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুললেন না। সস্মিত মুখে প্রস্থান করলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম্ম সেরে একটু অবকাশ পেয়ে, নীচে গিয়ে বসলুম। মেয়ে মহলের মাতব্বরগুলিকে ডেকে, ভৈরবী ঠাকরুণের যথার্থ-ভৈরবীত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে তাদের সাবধান করে দিলুম। কথা বলছি, এমন সময় আমাদের বুড়ো গয়লা খুড়ো, দুধ দিতে এসে একটু দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলি শুনলে। তারপর বললে, "গ্রামের ভদ্রলোকেরাও ভৈরবী ঠাকরুণের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ-শঙ্কিত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অন্তঃপুরে গিয়ে তিনি গভীর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করে,

মেয়েদের কাছে যে রকম কথাবার্ত্তা ব
আশঙ্কা করেছেন, ঠাকরুণটি কি একট
খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন! সকলেই পরস্পরকে সা
গয়লা খুড়োও আজ মাঠে গরু চরাতে গিয়ে
নির্জ্জন রাস্তায় সাঁকোর ওপর, ঠিক-দুপুরের
এমন সময় কোথা হতে জবা ফুলের মালা আ
দিয়ে ভীষণ গুণ্ডাকৃতি একটা লোক সেই দিকে
অগ্রপশ্চাতে থেকে দুইজনেই নির্জ্জন বনের দিকে

গয়লা খুড়োকে মিথ্যা কথা বলতে কখনো শুনি
তার পরদিন থেকে ভৈরবী ঠাকরুণ অদৃশ্য হলেন। এরপর
খোঁজ পাই নি।

উকিল শ্রোতাটী একটু হাসিয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ তিনি নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস করছেন। বুড়ো বয়সে আর কত খাটবেন?"

বিহারী সাতিশয় ক্ষোভের সহিত বলিল, "কিন্তু পুলিশের [illegible] বরকন্দাজগুলোর জন্যেই আমার ভাবনা। ওদের বদ্রিনারায়ণে তীর্থ সেবা করতে পাঠান দরকার, কিম্বা ওদের ভদ্র দস্তুর সহবৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটা স্কুল খোলা কর্ত্তব্য। চাণক্য বলেছেন—"মূর্খে নিযোজ্য মাণে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ। অযশশ্চার্থনাশশ্চ—"

মোহন বলিল, "বাকী টুকু পাঠান্তর করে বল—চক্ষুপীড়ৈব কেবলম্।"

ন-মাসিমা স্মিতহাস্যে বলিলেন, "ধনুষ্টঙ্কারের পর চক্ষুঃপীড়া! ভাল আমাদের খামকা দুর্ভোগের জন্যে কোন রোগ বরাদ্দ করবে ডাক্তার? জলাতঙ্ক? না স্নায়ু বিকার?"

জামাইবাবু

এক

রা রাত্রি। দ্বিপ্রহর বোধ হয় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।
এক্সপ্রেসখানা ঝাঁঝাঁ শব্দে আসিয়া আলোকোজ্জ্বল
ঢুকিল। গাড়ীর একটা তৃতীয়শ্রেণীর কাম্‌রা হইতে
মুখ বাড়াইল। নিদ্রাবেশ-জড়িত চক্ষু মুছিয়া, ষ্টেশনের নাম-
জানিবার জন্যই বোধ হয়, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা দম্‌কা ঝাঁকুনি দিয়া, ক্রমশঃ মন্থর-গতিশীল গাড়ীখানি
ঘচাং ঘচ শব্দে থামিল। তৃতীয় শ্রেণীর সেই কাম্‌রাখানি একটা আলোক-
স্তম্ভের সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। তরুণী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আলোক-
স্তম্ভের গায়ে লেখা ষ্টেশনের নামটা পড়িল। নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া
জানালার পাশে বসিয়া পড়িল। অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সেই বিপুল
জনাকীর্ণ কোলাহল-মুখর ষ্টেশনের শোভা দেখিতে লাগিল।

সামনে দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, "পান সিগ্রেট্ বাবু—পান
সিগ্রেট্।"

দায়ে পড়িয়া তরুণী উদাস ভাবে সরিয়া বসিল। লোকটা অদৃশ্য
হইতেই, আবার স্বস্থানে আসিয়া, প্লাটফরমে লোকজনের ছুটাছুটী দেখিতে
লাগিল।

অদূরে পুলের নীচে চশমা-চোখে সৌখীন ধরণের সজ্জা পরিহিত একটি
প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক হাতে কোঁচা, এক হাতে গ্লাডষ্টো

ব্যাগ ধরিয়া তিনি চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন—বোধ হয় মনের মত কোন একটা কামরা খুঁজিতেছিলেন। সহসা তরুণীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারকতক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া,হঠাৎ দ্রুতপদে সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার দিকে ঝুঁকিয়া যেন অতি কষ্টেই খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদেরই মহালক্ষ্মী যে!"

তরুণী অন্য দিকে চাহিয়াছিল—হঠাৎ এই আকস্মিক সম্ভাষণে [illegible] উঠিল! সবিস্ময় দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য ভদ্রলোকের দিকে [illegible]হিয়া [illegible]— সম্ভবতঃ চিনিতে পারিল না। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের [illegible] ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা! অবস্থা শোচনীয়! আজকাল [illegible] চিন্‌তে টিন্‌তে পার না দেখছি!"

পরিচিত মুখ এবং ততোঽধিক পরিচিত সেই শ্লেষ-ই বটে! মুহূর্তে তরুণী সসোজন্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নমস্কার করিল; সবিনয়ে বলিল, "জামাইবাবু! আসুন, আসুন—অনেক দিন পর দেখা। গাড়ীতে আসবেন না কি?"

"তবু ভাল! দয়া করে চিন্‌তে পেরেছ, এই ঢের! যা গৈবি চাল সুরু করেছ—আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল!"

অপ্রস্তুত এবং কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াই তরুণী বলিল, "মাপ করুন, সত্যিই চিন্‌তে পারি নি! আমার ভয়ানক মন্দ অভ্যাস—চেনা-লোকদের মুখ ভুলে যাই। গরীবের ত্রুটি ক্ষমা করুন অনুগ্রহ করে। তারপর কোথা যাচ্ছেন?"

"আসানসোল। তোমরা?"

"হুগলী।"

"একলা?"

"উহুঁ—এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে আছেন। ওঁকে বাড়ী পৌছে দিতে যাচ্ছি, উনি অসুস্থ।"

গাড়ীর ভিতর উঁকি দিয়া, নিদ্রিতা ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তবে ত এ কামরায় ওঠা হয় না। তাতে আবার থার্ড ক্লাস।"

"আপনার ইণ্টারের টিকিট বুঝি? আচ্ছা, তা হলে আসুন। আসানসোলে আবার—তা হলে—"

"ঐ যাঃ! হুইস্‌ল দিচ্ছে যে! ধর—ধর ব্যাগটা! পরের ষ্টেশনে নাম্‌ব না হয়।" জানালার ভিতর দিয়া ব্যাগটা পার করিয়া,ভদ্রলোক একটানে দুয়ার খুলিয়া উঠিলেন, পর মুহূর্ত্তে গাড়ী "চলি চলি পা পা" সুরু করিল।

ছোট কাম্‌রা। দুখানি মাত্র বেঞ্চি। একটিতে রুগ্না ঘুমাইতেছিলেন— অন্যটি জিনিষপত্র, মোট-পুঁটুলিতে পূর্ণ। তরুণী তাড়াতাড়ি জিনিষ সরাইয়া লইল। ভদ্রলোক ব্যাগটি পাশে রাখিয়া বসিলেন। বিনা ভূমিকায় শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা'পর নিরলা দেবি! তুমি নাকি কোন্ স্কুলের মষ্টারণী হয়েছ? খুব না কি সুখ-সম্পদ ভোগ কর্‌ছ?"

তরুণী জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে উদাসভাবে বলিল, "তা হবে!"

"হবে কি রকম? শুনলুম, ভায়ের ভাত তোমার পছন্দ হয় নি; তাই মাষ্টারী করে, কুলোজ্জ্বল করতে গেছ! বলিহারি বাবা, যা হোক্!"

গম্ভীর হইয়া তরুণী বলিল, "কি কর্‌ব? অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা তো মেটাতে হবে?"

"কেন? ভায়ের সংসারে থাক্‌লেই তো হোত।"

"ছিলুম তো অনেক দিন। ঝি-গিরি, রাঁধুনীগিরি, সবই তো করেছি। কিন্তু বড়লোক আত্মীয় তাঁরা—গরীবের ভার নিয়ে কত আর জ্বালাতন হবেন? তাই নিজের ভার নিজের বইবার চেষ্টা দেখ্‌ছি।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিশেষ বিজ্ঞ ভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "ছাখো, যার যা কর তা কর—মেয়েমানুষ হয়ে কখনও ঐ কাজটি ক'র না। শক্ত শাসনে না থাকলে মেয়েমানুষ কখনও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। স্বাধীন হলেই মেয়েমানুষ উচ্ছন্নে যায়।"

নিরলা ধীর ভাবে বলিল, "উচ্ছন্ন যাবার পথে স্বাধীনতা চাইলে—শুধু মেয়েমানুষ কেন জামাইবাবু, পুরুষ-মানুষরাও উচ্ছন্ন যায়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সে রকম দুর্ম্মতি ঘটবার আগেই যেন ভগবান আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন। কিন্তু, অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও একটা স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মেয়ে মানুষেরও আছে।"

"আহা-হা, স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মানুষের আছে বটে—কিন্তু মেয়েমানুষ যে আলাদা জাত গো!"

নিরলা বলিল, "অর্থাৎ? তারা মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত?"

জামাইবাবু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "ছাখো, আমাদের শাস্ত্র বলেছে—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রম্ অর্হতি'!"

নিরলা অধিকতর ধীরভাবে বলিল, "মনুসংহিতাখানা জামাইবাবুর সমস্তটা পড়া আছে কি? "শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনাশ্যত্যাশু তৎকুলম" ও কথাও মনু বলে গেছেন—দেখেছেন কি?"

উত্তেজিত হইয়া জামাইবাবু বলিলেন, "মনুসংহিতা ফনুসংহিতা বুঝি না বাপু—শাস্ত্র ঐ কথা বলে গেছে, তাই জানি। সীতা দেবী লক্ষ্মণের নিষেধ এড়িয়ে স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই রাবণ তাকে হরণ করতে পেরেছিল। শুনেছ?"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "শুনি নি—এই শুনলুম! এমন ভাবে কুতর্কের জের টানলে, আমায় জোড় হাত করে বলতে হবে—

পরাভব মানিলাম মূর্খের নিকটে!' কিছু মনে করবেন না। শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারা যে ভাবে নজীর উদ্ধার করেন—সে ভাবগুলো যেন একটু কেমন লাগে। আমিও শাস্ত্রের ক খ-গুলোর একটু খবর রাখি। রাগ করবেন না, তাতে—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে জামাইবাবু বলিলেন, "কম্বব বৈ কি! মেয়েমানুষ শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি বুঝে যে শাস্ত্রের খবর রাখবে? দু কলম লেখা পড়াই না হয় শিখেছ—তাই বলে শাস্ত্রের খবর তুমি রাখবে? বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমাদের। মেয়েমানুষের এত 'বাড়' হওয়া ভাল নয়।"

"তা হতে পারে। কিন্তু তাতে আপনাদের বিদ্বেষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবার কোন কারণ নেই। কেন না জ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি স্বয়ং মেয়েমানুষ। আর সুলভা যোগিনী—যিনি যোগ-শক্তি বলে জনক রাজা হেন মহাযোগীকেও একদা বিস্মিত, চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন—তিনিও মেয়েমানুষ! গার্গী, লোপামুদ্রাও আত্মবিজ্ঞান চর্চ্চা করে গিয়েছিলেন। তাতে ঋষিরা কেউ ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কি না জানি নে—তবে জ্ঞানচর্চ্চা অপরাধের জন্যে তাঁদের যে ফাঁসির হুকুম হয় নি—সেটা বোধ হয় সত্যি। আর লীলা, খনা প্রভৃতি মেয়েরাও জ্যোতিষ শাস্ত্র নাড়াচাড়া করে গেছেন—শুনে থাকবেন বোধ হয়। লীলার অদৃষ্ট ভাল। ভাস্করাচার্য্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন, সত্যিকার পণ্ডিত-ই তিনি; তাই লীলার হিংসে করে—নিজের পাণ্ডিত্য-প্রতাপ জাহিরের চেষ্টা করেছিলেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু খনা বেচারার বরাৎ জোর এমনি চমৎকার ছিল যে, খনার জ্ঞানচর্চ্চা অপরাধের জন্যে, তাঁর জ্যোতিষ-শাস্ত্রাভিমানী শ্বশুর—হিংসায় অন্ধ হয়ে—না—না, মাপ করুন জামাইবাবু! এত বড় শক্ত সত্যকে সহ্য করা আপনাদের 'কোমল-ধাতে' সইবে না হয় ত।

বরাহ ঠাকুর হিংসায় অন্ধ হয়ে নয়—আহ্লাদে গদগদ হয়েই,পরম স্নেহভরে পুত্রবধূর জিভটি কেটে ফেলেন! ঠিকই করেছিলেন। পুত্রবধূর সাধন-শক্তি যদি শ্বশুরের পাণ্ডিত্য-গৌরবকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ত—তা হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলুন দেখি—এই জগৎটার! দুনিয়া-শুদ্ধ মানুষের জাত-ধর্ম্ম তা হলে রসাতলেই যেত আর কি! খনা যদি জগতে আরও জ্ঞান প্রচারের সুযোগ পেত, তাহলে শুধু বিদ্যাভিমানী বরাহের কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্ঞানের আয়রণচেষ্ট্ গুলো পর্য্যন্ত নীলেমে চড়িয়ে দিয়ে ছাড়্‌ত! কেন না, আপনাদের মতে জ্ঞান-রাজ্যের জমিদারীখানা এতই ছোট, যে দৈবাৎ মেয়ে ওর দু'পয়সা এক পয়সার সরিকদার হলেই—পুরুষদের ষোল আনা ইজ্জৎ নষ্ট হয়ে যায়। হায় রে ভগবানের জ্ঞান-রাজ্য, আর হায় রে সে রাজ্যের জরিপি মাপের চৌহদ্দী!"

জামাইবাবু ঐ সব কথার অর্থ কি বুঝিলেন বলা যায় না! তবে তাঁর মুখ-ভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল—যা বুঝিলেন—তার ভাষাগত সংজ্ঞার নাম 'সমস্তই অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য!'

খানিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, বলিবার মত কথা কিছু খুঁজিয়া লইয়াই বোধ হয়, তিনি হঠাৎ বলিলেন, "মেয়েদের গুণের বড়াই সবই জানা আছে! বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাবার জন্যে মেনকা—"

বাধা দিয়া নিরলা বলিল, "তাতে মেনকার কোন স্বার্থই ছিল না জামাইবাবু—ছিল স্বার্থপর ইন্দ্রের নীচ ঈর্ষা! ইন্দ্র যত ডিগ্রী সাধনের জোরে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিল, বিশ্বামিত্রের সাধনার ডিগ্রী তার ওপরে যাচ্ছে দেখেই না—ইন্দ্র মেনকার ওপর হুকুম জারি করে বসেন। মেনকা পরাধীনা। তার স্বাধীনতা থাকলে সে কি কর্‌ত বলা যায় না এ ক্ষেত্রে। কিন্তু পরাধীন ভাবেই সে আসরে নেমেছিল। তার পর পবন দেবতার বজ্জাতির কথা মনে করুন। কিন্তু আপনাদের বিচার

এমি চমৎকার যে—কেলেঙ্কারীটা আসলে করলেন যাঁরা, তাঁদের নাম ধামাচাপা পড়ল, কেন না তাঁরা পুরুষ। কিন্তু তাঁদের হুকুম তামিল করে—তাঁরের স্বার্থের জন্যে যে আত্মবলি দিয়ে মরল, তার অখ্যাতি জগৎ জুড়ে রইল! কেন না—সে মেয়েমানুষ! রাবণের রাক্ষুসে বজ্জাতির কথাটাও তেমন তীব্র ভাবে আলোচিত হয় না, যেমন সীতার —ধর্ম্মের খাতিরে গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানোর কথাটার ছল খোঁজা হয়। উঠুন বড়দি—ওষুদ খান।"—হঠাৎ প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীকে জাগাইয়া তরুণী ঔষধ খাওয়াইতে ব্যস্ত হইল, জামাইবাবুর কোন মন্তব্য শুনিবার অপেক্ষা করিল না।

জামাইবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দুজনে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা হইল। ঔষধ খাইয়া প্রৌঢ়া গায়ে ঢাকা দিয়া জড়সড় হইয়া শুইলেন। তরুণী হাই তুলিয়া বলিল, "জামাইবাবু,বাঙ্কে উঠে ঘুমের চেষ্টা দেখুন না।"

মস্ত জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ় হতাশ ভাবে বলিলেন, "আর ঘুম! আজ একমাস ঘুম কাকে বলে জানি না। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি মারা গেছে। আহা, মেয়েগুলো যদি যেত, তার বদলে।"

"সে কি! আপনার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও মারা গেছেন। মোটে চার বছর বিয়ে করেছেন নয়? আহা কি হয়েছিল?"

"বহুদিন থেকে ভুগছিল। দ্বিতীয় মেয়েটা হবার পর থেকেই সুতিকা ধরেছিল—তার ওপরেই ছোট মেয়েটা হোল—"

তরুণী বাধা দিয়া বলিল, "তার ওপরই?"

প্রৌঢ় উগ্র বিরক্তিভরে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ। ভগবানের দেওয়া! মানুষের তো হাত নয়। না হলে বারণ করতুম। ওই মুখপোড়া মেয়ে তিনটের জন্যেই সে অসময়ে মারা গেল।"

তরুণী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বটে। তারপর ছোট মেয়েটি কত বড় ?

"তা মাস ছয়েকএর হবে। সেও আজ মরে কাল মরে, পুঁয়ে-পাওয়া চেহারা। মরে ত আপদ যায়, তা মর্‌ছে না ত।"

"অন্যায়! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধাও বটে! তাকে মানুষ কর্‌ছে কে ?"

তাচ্ছিল্যভবে প্রৌঢ় বিরক্ত স্বরে বলিলেন—"কে আর কর্‌বে? ওর বোনগুলোই কর্‌ছে।"

"তারাও ত বাচ্ছা! কচি বোনটাকে সামলাতে পারে ?"

"না পার্‌লে চলবে কেন?" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন। যেন তরুণীর প্রশ্নটা ভয়ানক নীতি-বিগর্হিত, ভীষণ অমঙ্গল দুষ্ট! সুতরাং তার উত্তরটা কঠিন শাস্তিযুক্ত না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে! অতএব রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তোমরা কেউ এসে মানুষ করবে কি? তার দিকে কেউ এগোয় না! এক বিধবা শালী ছিল—তাকে বললুম; সে বল্‌লে, চরকা কেটে দিন গুজরাণ করছি—ছেলে 'মানুষ' কর্‌তে পারব না।" একটু থামিয়া অধিকতর উত্তেজিতভাবে তিনি তীব্র শ্লেষভরে পুনশ্চ বলিলেন, "সব আপ্ত-সয়ালীর দল! বুঝেছ, মেয়েগুলো সব আপ্ত-সয়ালী! ওদের জুতোর তলায় পিষে রাখাই ঠিক—না হলে ওরা উচ্ছন্নে যায়।"

তরুণী স্তব্ধ!

২

জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রৌঢ় সশব্দে "থ্যাক্‌ থু" করিয়া থুতু ফেলিলেন। মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো! চক্ষে পারি না এ সব ফ্যাসান! লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "অর্থাৎ—আমায় দেখে আপনার ভয়ানক রাগ হচ্ছে—আর সেই রাগের ঝালটা এম্নি ভাবেই নানা ছুতোয় বর্ষণ করছেন! বুঝতে পারছি সব জামাইবাবু। এ সবের জবাব স্পষ্ট করে সত্যি কথায় বলতে হ'লে—সকলের আগে বলতে হয়—হে মা দুষ্টু সরস্বতি, খনিকক্ষণের জন্যে দয়া করে কাঁধে ভর দাও। যেন মিথ্যা আর ভণ্ডামির অত্যাচারকে একহাত ঠুক্‌তে পারি ম, এইটুকু কর।"

প্রৌঢ়ের দু'চক্ষু কপালে উঠিল। হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "নিরু! তোমায় 'হতে' দেখেছি আমি জান? গুরুজনদের সঙ্গে কি রকম করে কথা কইতে হয়, সেটা শিক্ষা কোরো। গুরুজনের সম্মান রেখো কথা বল।"

তরুণী স্মিতমুখে, বিনীত ভাবে বলিল, "দেখুন জামাইবাবু, রাগ করবেন না। সত্যের খাতিরে একটা কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—কথাটা মনে রাখ্‌বেন। গুরুজনরা যদি নিজেদের গুরুত্ব-সম্মানটা বাঁচিয়ে চল্‌তে না জানেন, তা হলে কোন লঘুজনের ঠাকুর্দ্দারও সাধ্যি নেই—তাঁর সম্মান বাঁচিয়ে রাখে! অনেকক্ষণ থেকেই বসে-বসে অনেক রকম ডেঁপোমি করছেন, চুপ-চাপ বসে বসে শুন্‌ছি সবই—"

"কি! ডেঁপোমি করছি?"

"তবে কি বল্‌ব? ভণ্ডামি, না ন্যাকামি? কোন্ বিশেষণটা শুন্‌লে আপনি খুসী হবেন বলুন, তাই বল্‌ছি। কিন্তু মাপ করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। ঝগড়া বা রাগারাগির চেষ্টা ছেড়ে দেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে যদি সত্য আলোচনার একটু এগিয়ে আসেন—তা হলে বড় বাধিত হই। আপনি শিক্ষিত লোক—আপনার শিক্ষার সম্মানটা একেবারে ভুলে গেছেন, এ কথাটা মনে করতে পারি না, পারি কি?"

জামাইবাবু একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "অত ভনিতার দরকার কি? মেয়েদের বেশী জ্যাঠামো আমি বরদাস্ত করতে পারি না, জানো? ও সব আস্পর্দ্ধা দেখে আমার ইচ্ছে করে পা থেকে জুতো খুলে পটাং পটাং মুখে বসিয়ে দিই!"

"বাহবা! বাহবা! এমন না হলে ইউনিভার্সিটির বি-এ ডিগ্রীর বাহার খোলে! বাঃ জামাইবাবু! দিন্ আপনার পা দুখানা এগিয়ে—প্রণাম করে একটু পায়ের ধূলো নিই!" তরুণী সত্য-সত্যই গল-বস্ত্রে হেঁট হইয়া ভদ্র-লোকটির পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া মাথা ঠুকিল; সবিদ্রূপ-হাস্যে বলিল, নিন্, জুতা খুলুন, পায়ের ধূলো নিই।"

অটল গাম্ভীর্য্যে উত্তর হইল, "তোমার ভক্তি থাকে, নিজ হাতে জুতা খুলে পা'র ধূলো নাও!"

"তা হলে ভক্তির মাত্রা হ্রাস করে হাত গুটোতে হচ্ছে!"

শ্লেষ ভরে প্রশ্ন হইল, "কেন? গুরুজনদের পায়ে হাত দিলে তোমার জাত যাবে?"

"আজ্ঞে না। আপনি আমার পূজনীয় গুরুজন সেটা সত্যি! তা বলে আপনার জুতোটাও যে আমার পূজনীয় গুরুজন এ কথা মনে করা যায় না। বিশেষ—আপনার ঐ জুতার তলায় 'কুষ্টে'-রোগীর রক্ত-পুঁজ-মিশানো ধূলো থেকে সুরু করে, রাজ্যের সমস্ত নোংরামির বিষ জমা হয়ে রয়েছে। আপনার ওপর ভক্তি দেখাতে গিয়ে—ও বিষকে দুহাতে তুলে ভক্তিভরে মাথায় স্থাপন করলে, আমার কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ ঘটাই বেশী সম্ভব! আপনাকেও তাতে সম্মানের নামে অপমান করাই হয়! নয় কি?"

কদর্য্য মুখ-ভঙ্গী করিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া মান্যবর জামাইবাবু ভেঙ্চাইয়া বলিলেন, "নয় কি? অ-হ-হ! কি কথাই বললেন! আমার অপমান!

আমার অপমান কিসে হবে শুনি? আমি পুরুষমানুষ আমি এইখানে দাঁড়িয়ে…!"

অতি অশ্লীল, ইতর ভাষায় তিনি এমন কদর্য্য উক্তি উচ্চারণ করিলেন, যা ভদ্র-সমাজে অকথ্য! তরুণীর আপাদ-মস্তকে উগ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝনা বহিয়া গেল! রুগ্ন, নিদ্রাচ্ছন্ন শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ তীব্রবেগে উঠিয়া বসিলেন! তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "শিক্ষিত ভদ্রলোক না কি আপনি? কেমনই যে আপনার শিক্ষা কেমনই যে আপনার ভদ্রতা—বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! নেমে যান গাড়ী থেকে, নামুন এখুনি! ইতর সমাজে গিয়ে আপনার ও ইতরামো প্রকাশ করুন গে, যথেষ্ট আদর লাভ করবেন।"

উঞ্ছ-প্রবৃত্তি শৃগালের অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বচাতুর্য্য-আস্ফালন যেন অকস্মাৎ —কোন তেজস্বিনী সিংহিনীর দৃপ্ত হুঙ্কারে—স্তব্ধ হইল! মাথা হেঁট করিয়া জামাইবাবু হঠাৎ নিস্পন্দ হইলেন!

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তরুণী বলিল, "জামাইবাবু, গুরুজন আপনি সত্যিই! কিন্তু আপনার এই নীচতা আমাকে কতটা আঘাত দিলে, বল্‌তে পার্‌ছি নে! ছিঃ, এত জঘন্য ইতর অন্তঃকরণ আপনার! ইতর কাপুরুষদর্পের নাম আপনাদের কাছে 'পৌরুষ'? আপনার জিভ্‌ আড়ষ্ট হয়ে গেল না নিজকে এতটা অপমান কর্‌তে?"

জড়িত স্বরে, তোত্‌লাইয়া-তোত্‌লাইয়া জামাইবাবু বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে বলিলেন, "কথাটা…কথাটা…ঠাট্টা মাত্র। ঠাট্টা…সিন্‌সিয়ারলি বল্‌ছি…কিছু মনে কর্‌বেন না। মাপ করুন আমায়" একটু খাঁক্‌রিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নিরুর বড় বোন আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রী—'

বাধা দিয়া নিরলা—অর্থাৎ তরুণী বলিল, "তার জন্য আমার মাথাটা আপনি এমন করে কিনে রাখেন নি, যাতে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার

করবার মত 'বোল ঝাড়তে পারেন। অপ্রিয় সত্যকে চেপে যাওয়াই মঙ্গল। দুঃখময় অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আত্মীয়তা সম্পর্কের দম্ভটা যখন বড় দম্ভভাবেই উচ্চারণ করলেন—তখন বড় দুঃখেই স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি জামাইবাবু—সম্পর্কটা মনে আছে। আর সে সম্পর্ক-দম্ভের শাস্তি-লাঞ্ছনাটা চিরদিন খুব ভাল করেই মনে থাকবে!"

যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইয়া, পরম নিরীহ ভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "কেন? কিসের শাস্তি-লাঞ্ছনা?"

ম্লান বেদনার হাসি হাসিয়া তরুণী বলিল, "আর সে পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? আপনার অনুগ্রহে আমার বাপ-মার চার চৌদ্দং ছাপান্ন পুরুষ উদ্ধারটা বহুদিনই হয়ে গেছে! বাপ-মাও আজ স্বর্গে। দিদিও আপনার পাশব নির্য্যাতনের অনুগ্রহে অকালে দেহরক্ষা করে বেঁচেছে। আজ কার জন্যে বলব, আর—"

চোখ লাল করিয়া জামাইবাবু ধমকাইয়া বলিলেন, "কি? পাশব নির্য্যাতন? জানো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটায় পশুভাবের কথা আসতেই পারে না—হিন্দুর ঘরে সেটা পবিত্র দেবভাব পূর্ণ।"

বৃদ্ধ শিক্ষয়িত্রী তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, "শুধু পবিত্র নয়, অতি পবিত্র, সুন্দর —আদর্শ, স্বর্গীয় গৌরব পূর্ণ—মহা পবিত্র দেবভাব! একটু অনধিকার-চর্চ্চা করতে বাধ্য হচ্ছি—ক্ষমা করবেন আমায়। আপনাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়—কিন্তু যা নির্লজ্জ ভণ্ডামি সুরু করেছেন, অত নির্লজ্জতা সহ্য করা সম্ভব নয়। পবিত্র দেবভাবের নামে মস্ত জাঁক-জমকের বক্তৃতা তো দিলেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত পবিত্রতা-জ্ঞানই যদি মনে আছে, অত দেবভাবই যদি হিন্দুর ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে—তা হলে কার্য্যক্ষেত্রে তিন-তিন দফায় আপনি কসাইয়ের ব্যবসা করলেন কেন?"

ব্যথিত স্বরে নিরালা বলিল, "কসাইয়ের ব্যবসা এর চাইতে ঢের ভাল বড়দি—ঢের ভাল! কসাইয়েরা দাম দিয়ে জানোয়ার কিনে এনে জবাই করে। কিন্তু এই যে বাংলার হতভাগা মেয়ে জবাই করবার ব্যবসা—যে ব্যবসা বাংলার বাবার দল ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে চালাচ্ছেন—এ নৃশংস ব্যবসার তুলনা কোথাও নাই। বাংলার বাবাদের বুক হাতুড়ীর ঠোক্করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—প্রতিদিন হাজার হাতুড়ীর ঘা সে বুকে বাজছে—কিন্তু এমন অগাধ আলস্যপরায়ণ, উহার ধর্ম্মশীল 'বাবার দল' আর কোন দেশে নাই। ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্মের অত্যাচার আর কোনখানে এমন অবাধে চলে নি, যেমন বাংলার বাবারা চালিয়েছেন! না জামাইবাবু, আপনাকে আমি কিছু দোষ দিচ্ছি নে —কিসের দোষ আপনার? লাথির ওপর লাথি, ঝাঁটার ওপর ঝাঁটা, জুতোর ওপর জুতো বর্ষণে,'করায়ত্ত অসহায় দুর্ব্বল নারীর ওপর নৃশংস শাসন-ক্ষমতা প্রচারের নাম যদি দেবত্ব-মহিমা হয়—তবে একবার কেন, লাখ্ বার আপনি দেবতা!—আপনাদের এ দেবত্ব, এ হেন স্বর্গীয় দেবভাব …"নিদারুণ যন্ত্রণা-নিষ্পেষণে নিরলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ঠোঁটে তার অসাধারণ সংযমশীল পরিহাসের হাসি এখনও জাগিতেছিল—কিন্তু চোখ দিয়া উচ্ছল উচ্ছ্বাসে সহসা দরদর জলস্রোত বহিয়া সে হাসির উপর ঢেউ খেলিয়া গেল!

চট্ করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জল মুছিয়া সে আবার সোজা হইয়া বসিল। অনুত্তেজিত ধীর কণ্ঠে বলিল, জামাইবাবু, বুঝি সব, জানি সব—কিন্তু আছি বোকা হয়ে! জানি নে কি জামাইবাবু, যেখানে আপনার মত মহৎ, উন্নত-রুচি-সম্পন্ন মহাপৌরুষমস্ত, বীরের দল দাঁড়িয়ে আছেন—সেখানে আপনাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সম্বন্ধে—সমস্ত ন্যায় জুতোর তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে! আমাদের কাছে সত্যি-সত্যিই

কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই!" ভদ্র মহৎ, স্বাধীন উদার, পূজার্হ দেবতা আপনারা। আপনাদের ঘরের পবিত্র দেবভাব—সেই লাথি-ঝাঁটা জুতোর সম্বন্ধটার মধ্যে পশুভাবের গন্ধ আছে বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে, রাগে আপনাদের চোখ লাল হয়ে উঠবে বৈ কি? কিন্তু যখন আমার বড় বোন, ঐ পবিত্র দেবভাবের মাহাত্ম্যে সিফিলিসের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়্‌ল—পবিত্র দেবভাবের মহত্ত্ব হানির অজুহাতে যখন তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করার মত যন্ত্রণায় মাসের পর মাস ধরে দুটি বছর ভুগিয়ে মারা হোল—তখন? না—দেবতা আপনি সত্যিই এই ত নির্জ্জলা দেবত্বের আদর্শ। পৃথিবীর কোন দেশ এ আদর্শের জুড়িদার আদর্শ দিতে পারবে না। তার পর—আরও একটু বলছি—অতিশয় ক্লেশের সঙ্গেই বলছি—আমার দিদি আপনাকে জ্যান্ত দেবতা বলেই মনে করতেন, সেটা সত্যি। আপনাদের ভণ্ডামির সম্মোহন মন্ত্রে তিনি এমন নিখুঁত দীক্ষালাভ করেছিলেন যে, আপনার সমস্ত পশুত্ব তাঁর কাছে দেবত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল; আপনার সমস্ত অন্যায় তাঁর চোখে ন্যায় ছিল। এমন ন্যায় যে—আপনি আপনার ভাজ, ভাইপো—সেই নাবালক আর বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু জাল জোচ্চুরির সাহায্যে ঠকিয়ে নিলেন, দিদি আমার সেটাও 'দেবত্ব' বলে অকপট চিত্তে মেনে নিলেন, এবং সেই সূত্রে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে আপনার পক্ষ সমর্থন করে এলেন! আদর্শ সহধর্ম্মিণী তিনি, সন্দেহ নেই। তার পর সে সম্পত্তি আপনি যখন বদমাইসিতে ফুঁকে দিলেন, তখন দিদি সেটাও দেবলীলা বলে মেনে নিলেন; এবং পাতিব্রত্যের মহিমা প্রচার করবার জন্যে—না—না, ভুল হোল। আপনার ঐ দেবভাবের মহিমা বলেই, আপনার কুৎসিত ব্যাধির অংশভাগিনী হোলেন। পুরুষ আপনি, স্বাধীন! পয়সার থলি আপনার নিজের হাতে! তাতে

আপনি স্বয়ং দেবতা! আপনি নিজের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী? না—সে স্ত্রীলোক, পরাধীনা; তার অর্থ-সঙ্গতি-হীনা। আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশী। তার ওপর দেবতার সহধর্মিণী 'দাসী' সে! সুতরাং তার চিকিৎসার কথাটা কেউ মুখেও আনলে না! সে যখন বিছানায় পড়ে শুধ্‌ছে, তখন অন্য স্ত্রী সংগ্রহের সশব্দ আয়োজন-উৎসব সুরু হয়ে গেল! সে শুনতে পেয়ে গভীর বেদনাভরে কাঁদলে! মূর্খ সে! বুঝলে না, দেবভাবের চরমোৎকর্ষ ফলই ফলছে! এ মধুরোজ্জ্বল দেবত্ব, এ মহামহিম দেবভাব—এই পশুভাবপূর্ণ প্রকাণ্ড পৃথিবীটার আর কোথাও নাই! যা আছে শুধু আপনাদের ঘরেই! ঠিক কথা!"

ঝাঁ-ঝাঁ শব্দে গোটাকতক ষ্টেশন পার হইয়া, গাড়ী সেই সময় আর একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। অপ্রসন্ন মুখে খিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে জামাইবাবু দুয়ার ঠেলিয়া দ্রুত নামিয়া পড়িলেন। কোন সৌজন্যের খাতিরে বিদায়-সম্ভাষণসূচক একটা শব্দও উচ্চারণ করিলেন না।

৩

জামাইবাবু প্লাটফরমে পা দেওয়া মাত্র, সহসা পিছন হইতে আর এক প্রৌঢ় আসিয়া তাঁর কাঁধ ধরিলেন। সহাস্যে বলিলেন, "কি হে অনিল-বাবু যে! দাঁত বাঁধিয়ে, চুলে কলপ লাগিয়ে, দানাপুর যাওয়া হচ্ছে যে! চতুর্থ পক্ষ ঠিক হোল দাদা? কবে বিয়ের দিন?"

তীরবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরার ভিতর একটা জলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়া, জামাইবাবু প্রায় তার স্বরে চীৎকার করিয়াই বলিলেন, "এই মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখানো,

বুঝলে অমৃত! সাত ঝ্যাঁটা মেরো এই লেখাপড়া-জানা মেয়ে মানুষের মুখে!"

ঈষৎ হাসিয়া অমৃতবাবু বলিলেন, "তার চাইতে এক ঘুসিতে তোমার বাঁধানো দাঁতগুলোর বংশ ধ্বংস করেই ফেলি না! ইউনিভারসিটির আহম্মক! বিয়ের বাজারে মোটা ঘুসখাবার জন্যে বি-এ পাশ করে কি সেই আদিম বর্ব্বরতা—তোমার মধুর জানোয়ারত্বটা এক ইঞ্চিও ছাড়তে পারনি দাদা! লজ্জা করে না তোমার?"

তৃতীয় শ্রেণীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, দুহাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া, হাসিমুখে তরুণী বলিল, "নাতির গলার আওয়াজ যে! কি বল্ছেন বাবাজি? ওর লজ্জা করে কি না জান্তে চাইছেন? না, না, না! লজ্জা কিসের? নির্লজ্জ ইতর বর্ব্বরতা প্রকাশের নামই যে এদেশের বাজারে 'পৌরুষ-প্রকাশ!"

গর্জ্জিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "কি! নিরু! তুমি আমার সাক্ষাতে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করছ? এর নাম তোমার শিক্ষা? দাঁড়াও, তোমার আত্মীয়দের কাছে তোমার বিদ্যের পরিচয় জানাচ্ছি! এই সব খ্যামটা-উদ্দীপনা করবার জন্যে তোমাদের শিক্ষে চাই, স্বাধীনতা চাই, কেমন?"

প্রৌঢ় অমৃতবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "দিদিমা, ভদ্রলোকটি আপনার কোন আত্মীয় হন কি?"

তরুণী হাসিমুখে বলিল, "নিশ্চয়! আত্মীয় না হলে এমন জেল-কিপারের শাসন-গৌরব কেউ দেখাতে পারে কি? উনি আমার বড় ভগিনীপতি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় বড় বোনটি আজ ন-দশ বছর হল দেহত্যাগ করে, ওঁর হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছেন!"

"তা হলে কুকুর-শাসন একটু করব না কি?"

হঠাৎ ট্রেণ ছাড়িল! অমৃতবাবু, জামাইবাবুর মতামতের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই, তাঁহাকে টানিয়া লইয়া সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর উঠিলেন।

তরুণী জিনিষপত্র সরাইয়া তাঁহাদের স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল—অমৃতবাবু বাধা দিলেন। নিজ হাতেই জিনিষপত্র সরাইয়া, জামাইবাবুকে পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই যে, বড় দিদিমাও রয়েছেন! নমস্কার! আজ মার চিঠিতে আপনার অসুখের খবর পেলুম। এখন একটু ভাল আছেন ত?"

সংক্ষেপেই উভয় পক্ষে কুশল-বিনিময় হইল। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী স্মিতমুখে বলিলেন, "মাঝ রাস্তায় হঠাৎ আপনার দেখা পাব, জানতুম না। কোথা যাচ্ছেন?"

অমৃতবাবু বলিলেন, "কলকাতা। পশু নাগাদ এলাহাবাদে ফিরব। আমার মা কেমন গিন্নিপন্না করছে, বলুন দেখি?"

হাসিয়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "খুব! এই সব মোটঘাট বাঁধা-ছাঁদা থেকে সুরু করে, গাড়ী ডাকিয়ে আমাদের বিদেয় করা পর্য্যন্ত—সব কর্ত্তৃত্বই তাঁর হাতে। আপনার ম্যানেজারমশাইকে সঙ্গে দিলেন, তিনি টিকিট করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।"

নিরলা স্নেহময় স্বরে বলিল, "সার্থক মা পেয়েছেন আপনি। শিক্ষিত পিতা ঢের আছেন; কিন্তু মেয়েকে এমন শিক্ষায় গড়ে তুলতে মনোযোগ খরচ করবেন—এমন সা-খরচে পিতা এ দেশে খুব কম! আপনার মত একটি পিতার মুখ দেখতে পেলেও, আনন্দ-গৌরবে আমাদের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে বাবা!"

আর্দ্র কণ্ঠে অমৃতবাবু বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন মা—

আমার 'মা'টাকে আমি যেন 'জগতের মা' হবার যোগ্যতায় গড়ে রেখে যেতে পারি! এই অধঃপতিত দেশে মাতৃশক্তির যে লাঞ্ছনা ঘটেছে আর ঘটছে—তার বিরুদ্ধে আমার মা-টাকে যেন মূর্ত্ত তিরস্কারের মতই—উদ্যত বজ্রের মতই—উগ্র কঠিন হয়েই দাঁড়াতে দেখি! লক্ষ্মী-শক্তিকে নির্য্যাতন করে তুমি লক্ষ্মী-শ্রী লাভ করবে? ভগবানের বিচার এতই বেহিসাবী ভেবেছ?"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হাঁ—এদেশ তাই ভেবে রেখেছে! এদের বিচারে তাই ভগবান শুধু বেহিসাবী নন—তিনি রীতিমতই ভণ্ড, জোচ্চোর, প্রতারক! এদের সুখ সম্পদ ভোগের অধিকারটা ভগবান শুধু জোচ্চুরি করেই কেড়ে নিয়েছেন, তা নয়; তিনি নেহাৎ শয়তানী করেই এদের শক্তিগুলা চুরি করে নিয়েছেন! নইলে—শক্তি থাকলে এরা, মানুষগুলোর—অর্থাৎ 'মানুষ' বলতে যাদের বোঝায়—তাদের মাথা হাতে কাটত!"

তরুণী হাসিল! বেদনাভরে বলিল, "বড় দুঃখ হয় বাস্তবিকই! এ দেশের মানুষদের মন, বুদ্ধি, হৃদয়কে বিচার করতে গেলে, বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখেই আমাদের প্রাণটা পিষে যায়। ছিঃ, এদের বিচার বুদ্ধি এত জঘন্য নীচ হয়ে পড়েছে! এত ইতরতা মানুষের! "সত্যঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এব ধর্ম্ম সনাতনঃ" শুনেছি বাবাজী; কিন্তু কুপৌরুষ দম্ভ-বলে, কদর্য্য মিথ্যাকে এমন নির্লজ্জ ইতরামোর সঙ্গে প্রচার করাও যে 'সনাতন ধর্ম্ম' তা জানতুম না!"

জামাইবাবু এতক্ষণ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতেছিলেন। এবার হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া মহাক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "থ্যাখো নিরো! পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করবার জন্যে যে তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তাও জানতুম না! কি 'খেয়াতি'ই রাখলে তোমরা

লেখাপড়া শিখে! ঐ একজন বুড়ী…” প্রৌঢ়ার উদ্দেশে তিনি কি বলিতে উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্তে অমৃতবাবু উঠিয়া বিনাবাক্যে জামাইবাবুর গলাটি টিপিয়া ধরিলেন; দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, “জিভ্ সামালে! নইলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব! কাপুরুষ, পশু! তোমার গুণের কাহিনী আমি কি কিছু জানি নে? পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী করতে এসেছ?

জামাইবাবু গাঁক-গাঁক শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—“ছাড়, ছাড়—তোমার পায়ে পড়ি গো!”

“এইবার পায়ে পড়ি! পথে এস!” অমৃতবাবু গলা ছাড়িয়া দিলেন। উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, “লম্পট ব্যভিচারীর দল! ব্যভিচারের দাসখতে নাম লিখিয়ে—মনুষ্যত্বকে দেউলে করে বসে আছ—ছাগল ভেড়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছ—আবার বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা সাজবার সখ্! জানো না, তোমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার সিংহগুলো এখনো মরে নি সবাই? তোমাদের মূর্খতার অত্যাচার চুপ করে সয়ে যাই বলে বড্ডই বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, নয়?”

ফোঁশ ফোঁশ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জামাইবাবু সক্রোধে বলিলেন, “তোমায় আমি কিছু বলি নি—তুমি কেন অপমান করলে? আমি মানহানির দাবীতে নালিশ করব!”

“এই মুহূর্ত্তে কর গে। এই নাও, আমি খরচ দিচ্ছি!” পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া জামাইবাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া অমৃতবাবু বলিলেন, “যাও, মামলা রুজু করগে। আর যা খরচ লাগে জানিও, পরে দেব! আপাততঃ ‘তিন শক্র’ দিয়ে রাখলাম!”

স

ভুল

মানু

"

দাঁড়াবে

অপ্রিয় বিচ্ছেদ–

হাসিয়া অমৃতব

আছে—চিরকাল থাক

অন্যায়ের সঙ্গে আমার

থাকবে না। সেই অন্যায়টার

কিন্তু আমি চিরদিন যেমন ভালবেসে

উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া জামাইবাবু

হয়েছে! তোমার ভালবাসাও আমার

আমার কাজ নেই। অসময়ে তুমি একদিন আমার [illegible] উপকার

আজ তার শোধ নিলে। যাও, আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব দেনাপাওনা চুকল!"

হাসিমুখে অমৃতবাবু বলিলেন, "মনেও কোর না সেটি! তোমার প্রকৃতির ব্যাধি—তোমার অন্যায়, তোমার নীচতা, তোমার জঘন্য ঈর্ষাকে তুমি যতক্ষণ না ছাড়্‌ছ, ততক্ষণ আমার পাওনা শোধ হবার নয়! ভূতের ওঝারা রোগীকে পিটিয়ে ভূত তাড়ায়, জানো বোধ হয়? বন্ধু তুমি!

ন্ত

ান,

থে—

র মন্দিরের
রসাতলে যায়,
। যে দেশের মেয়েরা
।মরা ওসব কাজ কর্‌ব?
হয়ে রয়েছে,চেয়ে দেখছেন
।র পাশে বসে রয়েছেন—ওঁকে
? ক্ষমা কর্‌বেন আমায়।" তিনি
রিয়া বলিলেন, "তিক্ত-কঠোর সত্য আমি
বেন আপনাদের এই দুর্ভাগা মায়ের অপরাধ!

ওদের ...র কি হয়ে দাঁড়িয়েছেন জানেন? শুধু দেহেন্দ্রিয়-গত সংজ্ঞা ছাড়া নারীর আর কোন অস্তিত্ব, কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন মৌলিকতা নাই! শরীর-মন-শক্তি ওঁদের বিচারে মনুষ্যত্বহীন, নারীর বুদ্ধিমত্তা ওঁদের কাছে ধোবার বোঝা-বহনকারী গাধা মাত্র। নারীর আত্মাকে জুতোর চাপে পিষে গুঁড়ো করাই ওঁদের কাছে মহা পৌরুষের পরিচয়! কারণ কি জানেন? ওঁরা অন্নবস্ত্রের মূল্যে, নারীর হৃদয়, মন, বুদ্ধি—আত্মার সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্বাধীনতা কিনে নিয়েছেন। শুধু

অন্নবস্ত্রের ঋণে এ দেশের নারী-শক্তি দেউল হয়ে গেছে! এই তাদের প্রকৃত অবস্থা!"

অমৃতবাবু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বলেছেন! একবর্ণও অত্যুক্তি নয়। এই অন্ন-বস্ত্রের ঋণকে যে নারী এড়িয়ে চলেছেন, তিনিই সমাজের বিচারে সমাজচ্যুতা! কেন না, যাকে হাতে মারবার বা ভাতে মারবার উপায় না থাকে, তার ওপর অবাধ অত্যাচারটা চলে না। চলে শুধু—কুৎসিত দুর্ব্বাক্যের অত্যাচার! কিন্তু এই প্রতারক, ভণ্ড, নীচ, ক্রূরচেতা পুরুষদের বিধান শিরোধার্য্য করে চল্‌বার দিন আর আপনাদের নাই মা। এ সমাজের কাছে সম্মান চাইবেন না। এ সমাজে কুক্কুরী-শূকরীদের সম্মান আছে, কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের জন্যে এখানে আছে শুধু অবজ্ঞা, ঘৃণা, কুৎসা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন! আপনাদের অবস্থার পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করুন। ডাকুন আজ বজ্র-নির্ঘোষে রুদ্র-আহ্বানে নিজের অন্তরাত্মাকে—বলুন তাদের—'ওরে চির লাঞ্ছিত, চির-প্রতারিতের দল! তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের কথাকে ভয় করে মাথা নোয়াস্ নে! কথার অত্যাচারকে যতই ভয় কর্‌বি অত্যাচার ততই বেড়ে উঠ্‌বে; কেন না, এ দেশ শুধু কথার দেশ! এ দেশ কাজ কর্‌তে জানে না, কিছু বুঝতে চায় না, শুধু নির্ভাবনায়—যা খুসী তাই—কথা কহিতে জানে! একথা গ্রাহ্য করবার নয়! তোরা ভয়কে আজ জয় করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হ। বিবেকের হাতে আত্মসমর্পণ করে—আজ তোরা মনুষ্যত্বের গ্লানিকর সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রুদ্র-শক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়া! ভগবানের জাগ্রত রূপের পূজায় আজ তোরা আত্মোৎসর্গ কর!"

গাড়ী আর এক ষ্টেশনে ঢুকিল। বাহিরে কুলির দল চীৎকার করিল "আসানসোল! আসানসোল!

সকলে চমকিয়া উঠিল! কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—বাহিরে রাত্রির আঁধার কখন ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়াছে—অজ্ঞাতেই কখন ভোরের আলো বাহিরের উদার, উন্মুক্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে! গাড়ীর বাতির আলো ম্লান করিয়া দিনের আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনজন বাহিরের আলোক আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিলেন। গাড়ীর গতি ধীরে থামিয়া গেল।

হঠাৎ সশব্দে গাড়ীর দুয়ার বন্ধ হইল। তিনজন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন জামাইবাবু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধ্যান করিয়াছেন। খোলা দুয়ারটা একজন টিকিট কলেক্টার বন্ধ করিয়া দিতেছে।

অমৃতবাবু হাসিমুখে বলিলেন, "ঐ যাঃ! চতুর্থ পক্ষের নিমন্ত্রণটা চাওয়া হোল না যে!"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "ও সব অভিশপ্ত নিমন্ত্রণের লোভ ছেড়ে দাও বাবা! ওগুলো ভদ্রলোকের ধাতে সহ্য হবে না!"